সাগর ভাঙার দিন

মোশাররফ হোসেন খান

সাগর ভাঙার দিন

www.pathagar.com

দ্রাবিড় প্রকাশন

www.pathagar.com

সাগর
ভাঙার
দিন

মোশাররফ হোসেন খান

দ্রাবিড় প্রকাশন

www.pathagar.com

সাগর ভাঙার দিন
মোশারফ হোসেন খান

প্রকাশক
হোসেন সৈয়দ

দ্রাবিড় প্রকাশন
২৫৬/২ (নিচতলা) সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার, ঢাকা -১২০৯

প্রথম প্রকাশ
ঢাকা বইমেলা ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
বেবী মোশাররফ

প্রচ্ছদ ও অলংকরন
গাজী তাসলিমা হ্যাপী

কম্পোজ : জীবনী কম্পিউটারস

মুদ্রক
খন্দকার কম্পিউটারস এন্ড প্রিন্টার্স
১, সেন্ট্রালরোড, ঢাকা।

দাম
পঞ্চাশ টাকা

Saagor Bhanger Deen
Mosharrof Hossain Khan

Published by
dravid prokation
256/2 (Ground Floor), Sultangonj
Rayer bazar, Dhaka-1209, Bangladesh.
Phone : Mob :

First edition : Dhaka Boimela 2002

Price : Taka Fifty only US$ 3

ISBN 984-32-0404-3

www.pathagar.com

'ভূগোলটারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ো
গড়ার জন্য ভেঙে ফেলা কাজটা অনেক বড়ো'

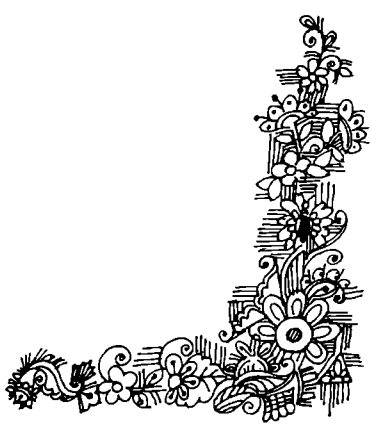

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা
হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে
ক্রীতদাসের চোখ
নতুনের কবিতা
বৃষ্টি ছুঁয়েছে মনের মৃত্তিকা
দাহন বেলায়

গল্প
প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান
ডুবসাঁতার

অন্যান্য
ঝিমায় যখন ঝিকরগাছা
অবাক সেনাপতি
রহস্যের চাদর
সাহসী মানুষের গল্প
বিপ্লবের ঘোড়া
হাজী শরীয়তুল্লাহ
সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর

সম্পাদনা
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

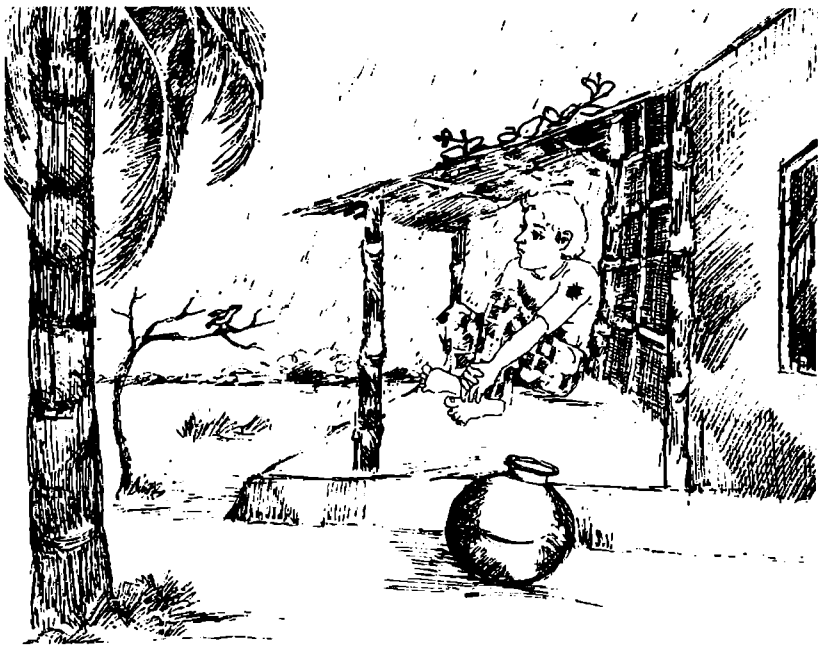

বৃষ্টিভেজা পাখির কান্না

ভাবছে পাখি আপন মনে এমন যদি হতো
খাঁচা ভাঙ্গার জন্যে মানুষ লড়ছে অবিরত!

একটানা বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে কষ্টটাও অনেক বেশি। অন্ত গাঁ–গেরামে। গ্রামের অবস্থা এখন আর আগের মত নেই। অভাব আর অভাব। সেই যে পুকুরভরা মাছ, গোয়ালভরা গরু— এসবই এখন ঠাঁই নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

www.pathagar.com

গ্রামের পুকুরগুলো শূন্য হাঁড়ির তলার মত খা-খা করছে। বিরান মাঠ। মাঠে ফসল নেই। গাছ নেই। কেবল দিগন্তজুড়ে ধূ-ধূ, যেন উত্তপ্ত মরুভূমি।

চারদিকে কেবল অভাবের কালো মেঘ। বিস্তার করে আছে গ্রামগুলিকে। ক্ষুধার জ্বালায় জমি গেছে, পুকুর গেছে, হালের বলদ গেছে। একে একে চলে গেছে ছাগল, হাঁস-মুরগী, এমনকি টুকিটাকি এটা-সেটা।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন ?

কতদিন চলবে এভাবে, অভাব এবং ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করে? জানেনা আনোয়ার।

কীভাবে সে জানবে?

সে জানেনা পথের দূরত্ব। জানেনা পথ চলার কৌশল। কিন্তু এতটুকু সে জেনে গেছে, এই কষ্টের সফর— বড্ড দীর্ঘ।

কথাটা ভাবতেই আনোয়ারের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বেদনায়। কামারশালার হাফরের মত কয়েকবার ওঠা-নামা করে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একরাশ দীর্ঘশ্বাস।

বাইরে বৃষ্টির একটানা মূর্ছনা। মূর্ছনাটি আনোয়ারের কাছে ক্ষুধার কান্নার মতই মনে হয়। আকাশটাও কি তার মত খেতে না পেয়ে কেবলই কাঁদছে ? জানে না সে।

তিন দিন হলো আব্বা বাড়িতে নেই।

মা বেরিয়ে গেছেন সেই কখন, বৃষ্টির মধ্যে। উদ্দেশ্য, খাবারের যোগাড় করা।

আনোয়ার ছাড়া বাড়িতে এখন আর কেউ নেই। বারান্দায় বসে একাকী সে তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। সামনের দিকে।

বৃষ্টি হচ্ছে। মুষল ধারায় বৃষ্টি। আনোয়ার এবার খেয়াল দিল বৃষ্টির দিকে। আকাশটা মেঘে ঢাকা। কখন সূর্য উঠেছে তা এই গ্রামের কেউ বলতে পারে না।

বাদলা-বৃষ্টির মজাটাই আলাদা। বারান্দায় বসে বসে কেবল বৃষ্টির ছন্দ দেখা— বিষয়টি মন্দ নয়। মন্দ নয়, এমন দিনে বৃষ্টির তালে তালে ছড়া আবৃত্তি করাও।

আনোয়ারও বারান্দায় বসে উঠোনের বৃষ্টি দেখছিল।

www.pathagar.com

আহ! কী চমৎকার! বৃষ্টির ফোঁটা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ছে নারকেল গাছের পাতা গড়িয়ে।

নারকেলের কাঁদির ওপরে একটি শালিক বসে আছে।

বৃষ্টির পানিতে সেও সমানে ভিজছে। ভিজছে কিন্তু কোনো প্রতিবাদ নেই। অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে উড়ে যাবারও তার কোনো তাগিদ নেই। ঠায় বসে এভাবে ভিজতেই শালিকটার যেন যত আনন্দ।

শালিকের দিকে তখনও আনোয়ারের দৃষ্টি যায়নি।

সে উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টির ছন্দের সাথে সাথে সেও ছড়া কাটছে :

ঝুমর ঝুমুর টাপুর টুপুর
ঝরছে বাদল সকাল দুপুর
বাজে যেন ঘুঙরি নূপুর
বাজনা থামেনা,
প্রজাপতি ফড়িংগুলো
উড়তে পারে না।

এটুকু আবৃত্তির পর তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ পরেরটুকু সে আর মনে করতে পারছে না। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মনে হলো। হ্যাঁ। তারপর? তারপর—

মেঘ গুড় গুড় মেঘের খামে
মুষল ধারায় বিষটি নামে
বিষটি নামে মুষল ধারায়
জগতটারে দিল ডুবায়
ধনীরা তো সুখে ঘুমায়
চোখটি খোলে না,
গরীবগুলো ক্ষুধায় মরে
কামলা চলে না।
ঝুমুর ঝুমুর টাপুর টুপুর
জলে কাদায় ঘোল,
ভাঙ্গা ঘরে শূন্য হাঁড়ি
একটুতে খায় দোল।

www.pathagar.com

এতক্ষণ বৃষ্টি নিয়ে আনোয়ার মানে— আনুর মধ্যে যে রকম আনন্দ ছিল, ছড়ার শেষের অংশটুকু পড়ে মুহূর্তেই সেই আনন্দ উধাও হয়ে গেল।

সত্যিই তো! বৃষ্টিতে বড় লোকদের অনেক আরাম। কিন্তু আমাদের মত গরীবদের? ইস্! কী যে কষ্ট তা বলে শেষ করবার মত নয়। কবিতার ভাষাই ঠিক। মুষলধারে বৃষ্টি হলে গরীবদের হাঁড়ি বাতাসে দোল খায়। যেমন দোল খাচ্ছে আমাদের হাঁড়ি।

তিনদিন ধরে বৃষ্টি।

তিন দিনের ভেতর মাত্র একদিন হাঁড়ি চড়েছিল উনুনে। তাও বহু কষ্টে। প্রায় না খেয়ে কাটাতে হচ্ছে দিনগুলো। খিদেয় এখনো পেটটা চোঁ চোঁ করছে।

খিদের কথা মনে হলে খিদেটা আরও বেড়ে যায়। যেমন ভয়ের কথা মনে করলে ভয়টা বেড়ে যায় অনেক বেশি।

পেটে হাত দিয়ে আনু দেখলো তার নাড়িগুলো যেন পিঠের সাথে লেগে যেতে চাইছে।

দুচোখ ফেটে তার কান্না উথলে উঠলো।

বৃষ্টির মধ্যেই মা বেরিয়ে গেছেন। পেটে হাত দিয়ে আনোয়ার যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। মা ঠিকই খাবারের যোগাড় করে আনবেন।

বৃষ্টি দেখতে দেখতেই আনুর চোখদুটো হঠাৎ করে আছড়ে পড়লো নারকেল গাছের দিকে। একটি শালিক সেখানে বসে আছে। নির্বিকার। ভিজছে একাকী। কিন্তু ডানাও এতটুকু ঝাঁপটাচ্ছে না।

শালিকের দিকে তাকাতেই আনুর বুকটা বেদনায় শিউরে উঠলো। শালিকটা এভাবে ভিজছে কেন? সে তো অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে পারতো!

পাখিরও জীবন আছে। আনোয়ার জানে। জানবে না? সে তো এখন ক্লাস এইটে পড়ে। জীব এবং জড় সম্পর্কে সে বইতে পড়েছে। জড় চলাফেরা করতে পারে না। কিন্তু জীবেরা পারে। পারে, কারণ তাদের জীবন আছে। আর যাদের জীবন আছে তাদের ক্ষুধা আছে। ব্যথা আছে। সুখ বা আনন্দও আছে।

আচ্ছা পাখিরাও কি আনন্দ অনুভব করে?

www.pathagar.com

ধ্যুত্ ছাই! করবে না কেন?

নিজেই প্রশ্ন করে। আবার নিজেই উত্তর দেয় আনু। হ্যাঁ, আনন্দ করেই তো। ওই যে একত্রে মিলে মিশে কেমন তাদের ভাষায় তারা কিচিরমিচির করে। এভাবেই তারা আনন্দ প্রকাশ করে।

কিন্তু ঐ শালিকটা এত চুপচাপ কেন? কেন জানি সেও বৃষ্টির মত সমানে কাঁদছে।

কাঁদছে! কিন্তু কার জন্য? সম্ভবত ওর মনে খুব কষ্ট। কিসের কষ্ট? ঠিক আমার মত কি? আমার তো অনেক-অনেক কষ্ট। কয়টা বলবো? এই যেমন এখন খিদের কষ্ট। আহা! বেচারী শালিকটাও বোধহয় আমার মত না খেয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে। কয়দিন না খেয়ে আছ ওগো শালিক ভাই!

আনুর গলাটা ধরে এলো।

কান্নাটা তার হলকুমের নিচে কেবলই তড়পাচ্ছে। শালিকের সাথে আবার তার নীরব আলাপন চললো। জানো, আমার মা আমার জন্যে খাবারের সন্ধানে গেছেন। তোমার? তোমার মাও কি গেছে?

.....

– জানো, আমি আজ তিনদিন প্রায় না খেয়ে আছি। তুমিও কি?

.....

– খিদেয় আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি! তুমি?

.....

– কাল রাতে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছেন। তোমার মাও কি কেঁদেছে।

.....

– তুমি গাছে বসে ভিজছো আর এই দেখো, আমি ঘরে বসে ভিজছি। দেখছো না, আমাদের ঘরের চালে কুটো নেই! তোমার মধ্যে আর আমার মধ্যে পার্থক্য কি, বলো?

.....

– পার্থক্য একটা অবশ্য আছে। সেটা কি তুমি জানো?

.....

– আমি স্কুলে যাই। বই পড়ি। আরে অমন করছো কেন? বুঝলে না, বই পড়ি বলেই তো আমি তোমাকে বুঝতে শিখেছি। তুমি তো আবার পড়তে

www.pathagar.com

জানো না। পড়তে না জানলে আমাকে চিনবে কেমন করে?

.....

– ও, চেন? কিন্তু কীভাবে?

.....

– কী বললে? আমরা মানে এই মানুষেরা খুব নিষ্ঠুর? এমন কথা তুমি বলতে পারলে?

.....

– দেখো, আমি তোমাকে বন্ধু বলেই মনে করেছি। এখন কিন্তু আমার রাগ চড়ে যাচ্ছে। আমরা তোমার শত্রু হলাম কেমন করে?

.....

– বলো কি? তোমার মা-বাবাকে মেরেছে!

.....

– তোমার বোনকেও!

– কিন্তু কীভাবে?

.....

– প্রতারণা করে?

.....

– সে আবার কেমন?

.....

– ও, তাই বলো। ফাঁদ পেতে। ইস্! কী আফসোসের কথা। সত্যিই দু:খিত আমি। এটা মোটেই উচিত হয়নি। আমার মা এখনো তো আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট ভাই– আইউবের জন্যে কান্নাকাটি করেন। করবেন না! হাজার হোক মায়ের মন! এসব কষ্টের কথা কি কখনো ভোলা যায়?

.....

– তোমার কষ্ট তার চেয়েও বেশি?

.....

– সে তো ঠিকই। তোমার চোখের সামনেই তোমার বাবা-মা, বোনকে ধরে নিয়ে গেছে! তুমি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছো। কিন্তু করবার কিছুই নেই। এত বড় অসহায় তোমরা!

www.pathagar.com

.....

– হ্যাঁ। এবার স্বীকার করছি, আমরা, এই মানুষেরা বড্ড বেরহম, পাষাণ। আমরা ভুলে যাই যে তোমাদেরও জীবন আছে। আছে সেই জীবনের জন্যে তোমাদেরও অনেক মায়া।

.....

– কেঁদো না ভাই শালিক। যদিও তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই তবু, তবুও এতটুকু অন্তত বিশ্বাস করো, আমাকে দিয়ে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমার বন্ধুদেরকেও তোমাদের বেদনার কথা জানাবো। তাহলে ওরাও আর তোমাদেরকে অত্যাচার করবে না।

.....

– ও। শহেরের কথা বলছো! না ভাই। আমি তো গ্রামের ছেলে। শহরের মানুষ কি আর আমার কথা শুনবে? ওরা রাজ্যির পাখি শিকার করছে। মনের আনন্দে। জানিতো এটা ঠিক নয়। এতে করে যে তোমরাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছো তা কিন্তু নয়। আমরা, আমাদের পরিবেশ, আমাদের চারপাশও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এটা তাদের কে বুঝাবে বলো?

.....

– আচ্ছা ঠিক আছে। আমার এক বন্ধু আছে শহরে। তার কাছে চিঠি লিখে দেব। অনুরোধ করবো, আর কেউ যেন ফাঁদ পেতে বা অন্য কোনোভাবে তোমাদেরকে শিকার না করে। হলো তো? এবার একটু হাসো তো। আহা! হাসোই না!

.....

– বুঝেছি। তোমার হাসিটুকু হারিয়ে গেছে শোকের জোয়ারে। ঠিক আছে। তুমি নেমে এসো। নেমে এসো নারকেল গাছ থেকে, এই আমার কাছে। এসো না!

.....

– সে কি! উড়তে পারছো না? কিন্তু কেন?

.....

– ডানা ভাঙ্গা! কীভাবে হলো?

.....

www.pathagar.com

– ইস্! সেই শিকারি? তোমার ডানাও ভেঙ্গে দিয়েছে? তোমাকে ধরার জন্যেও চেষ্টা করেছিল! তুমি কোনো রকমে জানে বেঁচে এসেছো! আজ! এখন বলো তো, তোমাকে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি!

.....

– কী বললে? দরকার নেই? না, তা হয় না। তুমি একটু চেষ্টা করো ভাই। আমার কাছে এলেই আমি তোমাকে সেবা করে সারিয়ে তুলবো। চেষ্টা করো না!

পাখিটার সাথে আনুর কথা হচ্ছিল আনমনে। কথা শেষ না হতেই মায়ের গলা শোনা গেল : আনু! কি করছিস?

মা! মা এসেছেন!

আনুর চোখদুটো চিক চিক করে উঠলো।

কাছে এসে মা বললেন, বাবা! আর একটু কষ্ট করো। মাত্র সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যায় খাবারের যোগাড় হয়ে যাবে। তুমি অপেক্ষা করো। ততোক্ষণে আমি কিছু ডাল-পালা সংগ্রহ করে আনি। তা না হলে আবার রান্না করবো কি দিয়ে!

মায়ের কথা শুনে আনুর চোখের কোণা ছলছল করে উঠলো।

মা বললেন, কাঁদছিস কেন? খিদের কষ্ট বড় কষ্ট। তবু তো সবর করতে হবে বাপ!

– শুধু খিদের জন্যে কাঁদছিনে মা!

– তবে?

– তবে? দেখো, আমাদের উঠোনের নারকেল গাছে একটি শালিক বসে আছে। ওর ডানাদুটো ভাঙ্গা। ভাবছি, ওর আর আমাদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই?

www.pathagar.com

মায়ের সমস্ত শরীর বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। মাথার চুল আর কপাল দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সেই অবস্থায় তিনি নারকেল গাছের দিকে তাকালেন। শালিকটাকে দেখলেন। তারপর আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, পার্থক্য তো আছেই। যেমন ধরো, আমরা একে অপরের সাহায্য করতে পারি। আমি তোমাকে আর তুমি আমাকে। কিন্তু ওরা তা পারে না। ওরা আমাদের চেয়েও অনেক বেশি অসহায়।

মায়ের কথা শেষ না হতেই শালিকটা হঠাৎ করে গাছ থেকে নিচে পড়ে গেল। এবং পড়েই সে আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকলো। অপলকে।

আনোয়ার এবং মা— দুজনেই শালিকটার কাছে এগিয়ে গেল।

শালিকটা তখনো তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

উঠোনে জমে থাকা বৃষ্টির পানি থেকে শালিকটাকে আনু টেনে তুললো হাতের মুঠোয়। পরম আদরে তার পালকে হাত বুলিয়ে দিল।

তার সাথে যেন আনোয়ারের কতকালের বন্ধুত্ব। সে শালিকটাকে মুখের ডান পাশে, কানের কাছে তুলে বললো, সেইতো এলে। একটু আগে এলে তো আর তোমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না!

মা দ্রুত এগিয়ে এলেন কাছে। বললেন, পাগল ছেলে! শালিকটা তো আর বেঁচে নেই।

– বেঁচে নেই!

– না, ওটা মরে গেছে।

– মরে গেছে?

আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো আনোয়ার।

বৃষ্টির পানির সাথে তার সেই কান্নার ঢল সব— সবই একাকার হয়ে গেল।

অবাক দৃষ্টিতে মা কেবল তাকিয়ে আছেন তার ছেলে আনোয়ার এবং সদ্যমৃত শালিকটার দিকে।

ওটা যেন শালিক নয়, সে যেন হারিয়ে যাওয়া তার ছোট্ট শিশু—আদরের আইউব হোসেন।

www.pathagar.com

ওই যে নদী আমার নদী

ওই যে নদী আমার নদী, কোথায় বা তার ঘর?
সে যে আমার বুকের ভেতর— নিত্য সহচর।

পাঁচদিন পর আব্বা বাড়িতে ফিরলেন।
তার চোখে-মুখে বিষণ্নতার কাল ছাপ।
বাড়ি ফিরে তিনি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।
সারা বিকেল আনোয়ার ছিল গাজীদের বাগানে।

www.pathagar.com

পাড়ার ছেলেদের সাথে হা-ডু-ডু খেলছিল। সন্ধ্যায় উঠোনে পা দিতেই সে আব্বার উপস্থিতি অনুভব করতে পারলো। দ্রুত দৌড় দিল পুকুরে। নেমেই গোটা চারেক ডুব দিয়ে আবার দৌড় দিল মসজিদের দিকে।

মাগরিবের নামাজ শেষ করে বই নিয়ে পড়তে বসলো আনোয়ার। তখনও আব্বার সাথে তার একটি কথাও হয়নি। মায়ের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে সে যেন কিছু একটা বুঝে নিতে চাইলো। মায়ের মুখটাও কেমন শ্রাবণের আকাশের মত ভার হয়ে আছে।

নামাজ শেষ করে, সেই জায়নামাজে বসে আব্বা অজিফা করেন। তাও প্রায় আধা ঘন্টার মত। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। খুব ধীর-স্থিরভাবে তিনি অজিফা সেরে তারপর তাকালেন আনোয়ারের দিকে।

আব্বা কখনও মারধোর করেন না। কিন্তু তার শাসনের ভাষা অন্যরকম। হাজার হোক শিক্ষক ছিলেন তো! শাসনের কৌশল বোঝেন তিনি।

কিন্তু আব্বার আজ তাকানোর মধ্যে কোনো শাসনের চিহ্ন দেখতে পেলনা আনোয়ার। বরং সেখানে কী এক করুণ নদী কেবলই টলমল করছে।

মা রান্নাঘরে। তিনিও কোনো কথা বলছেন না।

আব্বার চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকালো আনোয়ার। তিনি নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ছো?

– বাংলা।

– এ কদিন কি নিয়মিত স্কুলে গিয়েছিলে?

– জ্বী।

– পড়াশুনা ঠিকমত হচ্ছে তো?

– জ্বী।

আব্বা আবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। যেন গভীর মনোযোগের সাথে কিছু একটা ভাবছেন।

রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এলেন।

উঠোনে টেপারির মধ্যে মুরগীর বাচ্চাগুলো কেবলই চিঁউ চিঁউ করছে। এখনও কোঠায় তোলা হয়নি। খুব যত্নের সাথে বাচ্চাগুলো তুলে নিয়ে মা কোঠায় ভরলেন।

ছাগল দুটো বেঁধে রাখলেন তাদের কোঠায়। এবার তিনি লেগে গেলেন উঠোন পরিষ্কারে। তারাবাজির মত ছুটছে তার হাত-পা।

www.pathagar.com

মা! এই একটা মানুষ সংসারে। ঝড় আসুক–বৃষ্টি আসুক, গরম কিংবা প্রচণ্ড শীত। না, মায়ের কোনো অবসর নেই। নেই এতটুকু বিশ্রাম। হাড় কাঁপানো শীত যখন, আমরা সবাই যখন লেপের মধ্যে তুর তুর করে কেবলই কাঁপছি, তখন— তখনও মা, একমাত্র মা বাইরে। এটা-সেটা কাজ করেই যাচ্ছেন। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত।

গতবার, বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল। তখন সন্ধ্যা। হঠাৎ ঝড়ের তীব্রতায় জীর্ণ ঘরটি কেবলই দোল খাচ্ছিল। ভয়ে আব্বা আনুকে বুকে জড়িয়ে দৌড় দিলেন পাশের বাড়িতে। কাঁচা হলেও তাদের ঘরটা খুব মজবুত। আব্বা মাকে এত করে বললেন, চলো। তুমিও চলো আমাদের সাথে। ভয় হচ্ছে, ঝড়ে আমাদের নড় বড়ে ঘরটা পড়ে যেত পারে।

মা বললেন— পড়ুক। আপনি আনুকে নিয়ে চলে যান। আমি যাবো না। মরতে হয় এখানেই মরবো।

আব্বা জানেন, তিনি একবার যদি 'না' করেন, তাহলে শত চেষ্টা করলেও তাকে দিয়ে আর 'হ্যা' করানো যাবেনা। ভীষণ জেদী আর একগুঁয়ে। তার রাগটাও দারুণ মারাত্মক। কিন্তু তবুও, মায়ের কোনো তুলনা হয় না। কী এক অসম্ভব কষ্ট পরিশ্রম আর দরদ দিয়ে তিনি আগলে রেখেছেন এই সংসারটিকে। সেই কাকডাকা ভোর থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত তার কোনো বিরাম নেই। নেই এতটুকু বিশ্রাম। জ্বরে থর থর করে কাঁপছেন। সেই অবস্থাতেই তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ করে যাচ্ছেন নীরবে, নি:শব্দে। দুপুর পর্যন্ত কাজ করে সেই জ্বর নিয়েই আবার কখন গোসলও করে ফেলেছেন। কোনো মানা, কোনো নিষেধে কাজ হয়না। আব্বার আন্তরিক ধমকেও না।

মাকে ডাকলেন আব্বা।

মা আবার রান্নাঘরে ছুটে গেলেন। চুলার জ্বাল ঠিক করে ফিরে এলেন। আব্বা বললেন, কিছু জরুরি কথা ছিল।

– বলুন।

– একটু না বসলে কীভাবে বলবো?

– চুলোয় ভাত ফুটছে। শেষের পথে। তাহলে নামিয়ে আসি!

– এসো। তার আগে আমাকে একটা পান বানিয়ে দিয়ে যাও।

www.pathagar.com

– পান তো আপনার মাথার কাছে। একটু নিয়ে নিন। না হয় আনুকে বলুন। আমার ভাত সম্ভবত পুড়ে যাচ্ছে।

মা আবার চলে গেলেন রান্নাঘরে।

আব্বার পায়ের কাছে একটা ছেঁড়া বিছানায় বসে আনু পড়ছে। পড়ছে কিন্তু তাদের সকল কথাই আবার তার মধ্যে শুনছে। পান দেবার কাজটা পেয়ে সে মনে মনে একটু খুশি হলো। খুশি হবার কারণ— এ কয়দিন সে আব্বার কাছ থেকে দূরে ছিল। আজ যদিও তিনি এসেছেন, কিন্তু তেমন কথা হয়নি। কেমন যেন একটা শূন্যতা তার মধ্যে কাজ করছে। ভাবছে, আব্বা আমার ওপর রেগে নেই তো?

পান সাজিয়ে আব্বার মুখের কাছে হাত নিয়ে আনু বললো, নিন। আপনার জন্যে পান এনেছি।

– চুন বেশি দাওনি তো? সেদিন একবার তোমার বানানো পান খেয়ে চুনে জিভ পুড়ে গিয়েছিল।

আনু সলজ্জ হাসিতে বললো, আমি কি আর পান খাই যে চুনের অনুমান বুঝবো?

আব্বা এবার বেশ মজা করে হেসে উঠলেন। তার মাথাটা বুকের কাছে এনে আব্বা বললেন, মুরুব্বি আমার, যেন রহিম বকস।

www.pathagar.com

রহিম বকস, মানে দাদা। আব্বার কথা-বার্তাই এমন। যখন মেজাজ ভাল থাকে তখন তার কথায় যেন মধু ঝরে।

মায়ের ব্যাপারটি অবশ্য আলাদা। তিনি কখনও ডাকেন আককাস শেখ অর্থাৎ নানার নাম ধরে। তার বাপের নাম ধরে আনুকে ডাকার সময় মায়ের দরদটা যেন উথলে ওঠে। কারণ আছে। মা যখন খুব ছোট্ট, তখনি নানী মারা গেছেন। মা আর বাপের আদর দিয়ে নানা তার মেয়েটাকে বড় করে তুলছিলেন। সেই বাপও চলে গেলেন অকালে, রোগে ভুগে। এসব দু:খের কথা আনু শুনেছে মায়ের কাছে। মায়ের কথা শুনতে শুনতে আনুর চোখও ভিজে গেছে কতদিন। মনে হয়েছে, মা আমার— জনম দুখিনী এক মা। শত কষ্ট, শত বেদনার মধ্যেও তিনি দাঁড়িয়ে আছেন টানটান। কী এক আত্মবিশ্বাস আর অপরিসীম স্বপ্ন এবং আশা নিয়ে তিনি এখনো, এই বয়সে সংসারের হাল ধরে আছেন।

সন্দেহ নেই, তার স্বপ্ন এবং আশা— সে কেবল আনুদের কেন্দ্র করেই। আনুর ভয় হয়— পারবে কি, সে কি পারবে মায়ের সেই স্বপ্ন-সাধ পূরণ করতে!

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মা এসে দাঁড়ালেন বারান্দা বরাবর। আব্বার মাথার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন?

আনুর কান খাড়া হয়ে আছে মায়ের কথার দিকে। দেয়ালে বালিশ লাগিয়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন আব্বা। মাকে বললেন, একটু বসতে হবে।

— বসবো কীভাবে? রান্না করছি না! ডালপালার জ্বাল। ভয় লাগে জ্বলন্ত চুলা ফেলে রেখে আসতে।

— তবুও একটু বসতে হবে। খুব জরুরি একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো।

— তাহলে আর একটু সবুর করুন। তরকারিটা নামিয়ে আসি।

— সেটাই ভাল। যাও। ততোক্ষণে আনুর পড়াটা একটু দেখি। আজ ক'দিন হলো কোনো খবরই নিতে পারিনি।

মা রান্না ঘরে চলে গেলে আব্বা ফিরলেন আনুর দিকে। কী পড়ছো বাবা?

মুখে জবাব না দিয়ে বই নিয়ে আনু আব্বার আরও কাছে চলে এলো।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন, কী, বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন চলছে?

www.pathagar.com

— ভাল।

— কতটা ভাল ?

এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছে না আনু। আব্বাই উদ্ধার করলেন, যেগুলো দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো পড়েছ তো?

— জ্বি।

— আমার মনে হয় ওর ভেতর থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে। ওগুলো ভালভাবে শিখে রাখলে আশা করি অসুবিধা হবে না।

আব্বা না বললেও আনু এটা জানে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার সময় সবাই প্রাইভেট পড়েছিল। আনু পড়েনি। প্রাইভেট পড়ার মত তার তেমন কোনো অবস্থা ছিলনা। সে পড়েছিল কেবল আব্বার কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! তাদের স্কুল থেকে কেবল সেই বৃত্তি পেয়েছিল। এখনো ক্লাসে প্রথম হয়। প্রতি বছর। আব্বাই পড়ান। তার পড়ানোর ধরন বেশ চমৎকার। একেবারেই আলাদা। বাংলা, ইতিহাস কিংবা ভূগোল— এসব বই যদি একবার তার কাছে বসে পড়া যায়, তাহলে পুরো বিষয়গুলো হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে যায় যে ঐ পড়া আর কখনো ভুলে যাবার নয়। গল্পচ্ছলে তিনি কেমন করে বুঝিয়ে যান অনায়াসে।

আব্বা ছিলেন প্রাইমারী শিক্ষক। সারা জীবন ছাত্র পড়িয়েছেন। একজন আদর্শবান শিক্ষক হিসাবে তার সুনাম প্রচুর। চারপাশের মানুষ তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। কথা বলে সম্মানের সাথে। তার সারা জীবনের অর্জন তো কেবল এইটুকুই।

www.pathagar.com

এইটুকু বলতে সত্যিই তাই। সহায়-সম্পদ কিছুই ছিলনা। তিনি নিজেও চাকরি করে কিছুই করতে পারেননি। কেবল সামান্য বেতন দিয়ে কোনো রকমে এতকাল সংসারটাকে টেনে নিয়ে এসেছেন। এখন তাও পারেন না। কারণ তিনি অবসর নিয়েছেন। অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে। কিন্তু অবসর পাননি সংসার জীবনের ঘানি টানা থেকে।

শত চেষ্টা করেও তার পেনশনের টাকাটা এখনও উদ্ধার করতে পারেননি আব্বা। ঐ টাকার জন্যে আব্বা সেদিন শহরে গিয়েছিলেন। পেয়েছেন বলে তো মনে হচ্ছে না। টাকা পেলে এমনভাবে বিষণ্ন থাকতেন না। আব্বা টাকা পাননি। পাবেন কেমন করে? তিনি যে আদর্শ নিয়ে মানুষ হয়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন, সেই আদর্শ কি আর আজ বেঁচে আছে? তারই ন্যায্য প্রাপ্য টাকা, সেই টাকা নিতে গেলেও নাকি ঘুষ দিতে হবে। আব্বাও খুব শক্ত মানুষ। তিনি কিছুতেই ঘুষ দেবেন না। দেবেন কেন? ঘুষ দেবার কিংবা খাবার শিক্ষা নিয়ে তিনি তো বড় হননি। রহিম বকসও ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি তো তারই ছেলে।

কিন্তু পেনশনের টাকা না পাবার কারণে সংসারের কষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে অনেক গুণে!

নিয়মিত কোনো আয়-রোজগার নেই

সংসারটা চলে কীভাবে? ফলে অভাব তাদের নিত্য সাথী।

খেয়ে-না খেয়ে আনু স্কুলে যায় প্রতিদিন পায়ে হেঁটে। তার পায়ে কোনো স্যাণ্ডেলও নেই। খালি পা। লুঙ্গিটা তালি দেয়া। জামাটা শত ছিন্ন। মাথায় তেল জোটে না নিয়মিত। বইপত্রও ধারকর্জ করে পড়তে হয়। তবুও আনু প্রতিবারই ক্লাসে প্রথম হয়। স্কুলের সবার দৃষ্টি তার দিকে। ছাত্ররা হিংসা করে, তবুও তাকে ভালবাসে। শিক্ষকরা স্নেহের চোখে তাকান। তাকে নিয়ে গল্প করেন। কেউ কেউ তার অভাবের সুযোগ নিয়ে করুণার দৃষ্টিতেও তাকাতে চায়। আনু যখন সেটা বুঝতে পারে তখন তার খুব কান্না পায়। মনটা ভেঙ্গে যেতে চায়। আবার যখন নি:শর্ত ভালবাসা পায় তখন সে ভুলে যায় সকল বেদনার কথা।

বড় ভাই সানোয়ার তার চেয়ে ভাল ছাত্র। তার প্রতিভার কথা জানে দশ গ্রামের সবাই। ম্যাট্রিকে সে স্ট্যাণ্ড করেছিল। এখন লজিং থেকে আই এ পড়ছে।

www.pathagar.com

আনু, সেও সিক্স-সেভেন দুটো বছর লজিং ছিল পাশের গ্রামে। স্কুলটা ছিল কাছেই। কিন্তু ঐ দুবছর লজিং থেকে সে বুঝেছে, লজিং জীবন কতটা কষ্ট এবং বিড়ম্বনার।

লজিং-এর কথা মনে পড়লে বড় ভায়ের জন্যে তার মনটা কেঁদে ওঠে। আহ! না জানি সেখানে তার কত কষ্ট! কত শূন্যতা!

কলারোয়া এমন কোনো দূরে পথ নয়। মাত্র দশ মাইল। যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকার কারণেই না যত্ত বিড়ম্বনা। পায়ে হাঁটা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। সাইকেল থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু যেখানে দুবেলা পেটে দুটো ভাতই জোটে না, সেখানে সাইকেলের স্বপ্ন দেখা আর মেঘের ওপর ঘর বাঁধা একই কথা।

সানোয়ার কলারোয়ায় লজিং থেকে পড়ছে। লেখাপড়ায় সে এতই ব্যস্ত থাকে যে এখন আর বন্ধের দিনও একবার বাড়ি আসতে পারে না।

তার বিচ্ছেদে আনু সকল সময় বিষণ্ন থাকে। খেলার সাথী বলি আর বন্ধুই বলি, ঐ একজনই তো। তার সাথেই যত খুনসুটি। আবার তার সাথেই যত মাখামাখি।

বড় ভাইয়ের কথা মনে হতেই আনু কেমন আনমনা হয়ে যায়।

কত কথা, কত স্মৃতি তার মনে পড়ছে। কয়টা বলে শেষ করা যায়!

এইতো ক'বছর আগের কথা।

পৌষ মাস। কনকনে শীত। সেই শীত উপেক্ষা করে দুই ভাই খুব ভোরে উঠে পড়েছে। গায়ে চাদর নেই। গরম কাপড় নেই। কোনো রকম ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়ে শরীর ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা।

তারা যাচ্ছে কোচুর বিলে। উদ্দেশ্য ধান কুড়ানো। কোমর পানি, কোথাও বা গলা পানি। এই পানি ভেঙ্গে আমন ধান কুড়াতে হবে। দুজনের কাঁধে দুটো ছোট্ট ঝুড়ি। ঝুড়ি দুটো ভরে তুলবে তারা ধানের লম্বা লম্বা সোনালি শীষে।

এভাবে ধান কুড়িয়ে, জমা করে, সেই ধান বিক্রি করে তারা বইপত্র কেনার টাকা জোগাড় করবে। কখনো বা সেই ধান দিয়ে তাদের কয়দিনের খাবারে যোগাড় হয়ে যায়।

ছুটির দিনে তারা ভোরে উঠে দৌড় দেয় কোচুর বিলের দিকে।

কম দূর না।

www.pathagar.com

তাও প্রায় মাইল দেড়েক। শির শিরে ঠাণ্ডা। পানিতে পা দেবার সাথে সাথেই মাথার তালু পর্যন্ত হিম হয়ে ওঠে। দাঁতে কপাট লেগে যেতে চায়। এই অবস্থায় গলা পানি ভেঙ্গে ধান কুড়ানো কম কষ্টের কাজ নয়। তবু, তবুও একটা স্বপ্ন, একটা আশা নিয়ে তারা দুই ভাই এই অসাধ্য সাধন করেছে দিনের পর দিন।

প্রতিদিনই, কোচুর বিলে ধান কুড়াতে কুড়াতে বেলা পশ্চিমে হেলে পড়ে। সেই সাত সকালে ক'টা পানি-পান্তা খেয়ে বেরিয়েছে দুই ভাই। সারাদিন পেটে আর দানা-পানি পড়েনি। ঝুড়ি ভরতে এখনো বাকি। আনুতো বেশি ছোট। সে আর পেরে উঠছে না। খুব মিনতি করে, প্রায় কাঁদোস্বরে বলে, চল্ ম্যাভাই, বাড়ি যাই। আর থাকতি পাচ্চিনে। যেমন শীত তেমনি খিদে।

সানোয়ার দরদের স্বরে বলে, আর এটটু দাদু। চল্ আর কডা কুড়ায়ে তারপর যাবানে। আবার সেই শুক্কুরবার ছাড়া তো আর আসতি পারবো না।

কি আর করা। বাধ্য হয়ে আরও কিছু সময় পানি চটকানো। তারপর তারা যখন বিলের কিনারে ওঠে, ঠিক সেই সময় মসজিদে আজান পড়ে মাগরিবের।

তুত্তুর করে কাঁপছে দুইভাই। কাঁধে ধানের ঝুড়ি। দৌড়াচ্ছে তারা। পিঠের সাথে লেগে গেছে অভুক্ত কচি পেট। আনু বললো, ম্যাভাই, আরতো পাত্তিছিনে। পা লাগে যাচ্চে।

– এই তো দাদু আর এটটু। আমরা তো বাড়িই যাচ্চি।

– কিন্তুক শীতে যে দম বন্দ হয়ে যাচ্চে!

– আমারও। নে ধর, আমরা গান গাতি গাতি দৌড়াই। তালি গাডা গরম হয়ে উঠপ্যানে।

– ঠিক আচে, ধর।

দুই ভাই গাওয়া শুরু করলো :

নইলা নইলা দুই পাতা
নইলার বে কোলকাতা।
নইলার সাথে যাবে কে

www.pathagar.com

দুডো ঘুগ্‌গো সাজেছে।
এট্‌টা ঘুগ্‌গো যাবেনা
নইলার বে হবে না।
তাল গাচে টিনের বাটি
তাতে বসে জাওনা কাটি।
ও সোনার বুবুগো! পাড়ায় যেওনা
পাড়ার লোকে গাল দেবে,
গাল শুনোনা না।
* * *
তাল তলা দে পানি যায়
পুটি মাচে গান গায়
ও দুলালের মা—
স্যায়না মায়ে ঘরে রেকে
দুক্কো দিওনা।

গান গাইতে গাইতে দুইভাই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আব্বা-মা দুজনই কেমন অসহায়ের মত বেদনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কচি দুটো ছেলের দিকে।

তাদের মুখে কোনো ভাষা ফোটেনা।

যে ভাষায় তারা ঐ সময় নীরবে কথা বলেন, সেই ভাষা তো কেবল অনুভবের বিষয়!

বেশ রাত করে, দুইভাই ঘুঁটির আগুনে শরীর গরম করে তারপর আবার বসে যায় বই নিয়ে। কোনো কোনোদিন হারিকেনে কেরোসিনও জোটে না। কত কষ্ট করে, কত কৌশলে যে তারা লেখা-পড়া করে সেটা কাউকে বুঝানো যাবে না।

এভাবেই তারা সংগ্রাম করে, জীবনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

ক্রমাগত।

বারান্দায় শুয়ে আছেন আব্বা। মা ঘরের ভেতর। সানু-আনু দুই ভাই আব্বার দুইপাশে শুয়ে আছে।

www.pathagar.com

আব্বার শেখানোর কৌশলটাই আলাদা

ঘুমানোর আগে তিনি গল্প শোনান দুই ছেলেকে। কিন্তু প্রতিটি গল্পেই থাকে এমন সব বিষয়— যা জীবনের জন্যে আলোক সমান।

সেই সব গল্পে থাকে সাহস, ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, আদর্শ, সংগ্রাম এবং ন্যায়ের এক মহান সূর্য। আব্বার কাছে গল্প শুনতে শুনতেই তো কতবার দুইভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা বড় হয়ে ঠিক মুহাম্মদ আলী-শওকত আলীর মত দুই ভাই হব। কখনো বা হতে চাইতো হাজী মুহাম্মদ মহসীন, কখনো বা তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং বখতিয়ার।

এসবই ছিল আব্বার গল্পের জাদুকরী সেই প্রভাব।

এক রাতে আব্বা বললেন, তোমরা কি মাইকেলের নাম শুনেছো?

আনু বললো, শুনেছি।

– তার বাড়ি কোথায়, জান?

– না।

– এই তো সাগরদাঁড়িতে। তোমাদের নানার বাড়ির কাছেই।

- নানার বাড়ি? আমরা তো সেটাও চিনিনে।

আব্বা একটা দম ফেলে বললেন, চিনবে কেমন করে? তারা তো কেউ আর বেঁচে নেই। যাক, বলছিলাম মাইকেলের কথা। তার বাড়িটা কিন্তু কপোতাক্ষর ধারে। কপোতাক্ষকে নিয়ে তার একটি বিখ্যাত কবিতাও আছে। শুনবে?

- হ্যা, শুনবো।

আব্বা দরাজগলায় আবৃত্তি শুরু করলেন।

তার কবিতা আবৃত্তির ঢংটা খুবই চমৎকার। ভাল লাগে। মজা লাগে। তিনি যেন কবিতার প্রতিটি শব্দের সাথে মিশে যান। মিশে যান কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব এবং অর্থের সাথেও।

তিনি সম্ভবত বুঝতে পারছিলেন, এই বয়সে অত শক্ত কবিতা ছেলেরা বুঝতে পারছে না। বললেন, এবার শোনো কপোতাক্ষকে নিয়ে আর একটি মজার কবিতা। শুনবে? বলেই তিনি শুরু করলেন :

www.pathagar.com

ঘুম ভাঙলেই যাই ছুটে যাই কপোতাক্ষ গাঙে
তার ডাকে যে সাত সকালে ঘুমটি আমার ভাঙে।
তার বুকে যে ছন্দ দোলে
অষ্টপহর জিকির তোলে
ঢেউয়ের দোলায় যায় ভেসে যায় হাজার মনের ভাষা,
ওই ভাষাতেই মিশে আছে আমার যত আশা।
সবাই বলে, কী আর এমন! কীইবা ওতে আছে?
আমি কিন্তু অনেক ঋণী কপোতাক্ষর কাছে।
ওই যে নদী আমার নদী কলকলিয়ে চলে
ফুল-পাখিদের সাথে সে যে আমার কথা বলে।
মনটা আমার রয় পড়ে রয় কপোতাক্ষ বুকে,
ব্যক্ত করা যায় কি সব ভাষা কিংবা মুখে?
ওই যে নদী স্মৃতির নদী শুনছো কি তার হাসি?
হুমড়ি খেয়ে পড়ছে পরী—দেখছে জগতবাসী।
কপোতাক্ষ কপোতাক্ষ—কী যে মধুর ডাক!
মায়ের কেশের মতই সে যে নিচ্ছে শত বাঁক।
ওই যে নদী আমার নদী, কোথায় বা তার ঘর?
সে যে আমার বুকের ভেতর-নিত্য সহচর।

আব্বার কবিতা আবৃত্তি শেষ না হতেই তারা দুটো ভাই-ও হারিয়ে যায় কপোতাক্ষর স্মৃতিময় বুকে।

সত্যি তো! বাংলাদেশ নদী, বিল হাওড়ের দেশ। কিন্তু কপোতাক্ষর মত এত আপন, এত কাছের, এত মিষ্টি নদী কি আর একটাও আছে?

আছে কি এমন সুন্দর আর একটি নদী?

কপোতাক্ষতে নেমে তারা দুইভাই যেন স্মৃতির পানিতে কেবলই ডুবসাঁতার খেলছে।

কেবলই।

www.pathagar.com

মাঠের পরে মাঠ চলেছে

মাঠের পরে মাঠ চলেছে বিলের পরে বিল
ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে, নীল আকাশে চিল।

গ্রামটি আসলেই ছবির মত। বাড়ির দক্ষিণ, পুব দিকে বিস্তারিত মাঠ। বারান্দায় বসে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাঁকড়া, মুকুন্দপুর, শুকুর খোলা, মাঠশিয়া, নগর, দিগদানা, মেঠোপাড়া।

এতগুলো গ্রাম এবং গ্রামের শোভা দিয়ে ঘেরা দুপাশের খোলা বিশাল এই মাঠটি।

www.pathagar.com

মাঠশিয়ার পিঠ বেয়েই তরতর করে বয়ে গেছে কপোতাক্ষ।

বাঁকড়া বাজার থেকে বহু বাঁক নিয়ে তারপর সে নেমেছে খোরদো হয়ে, সাগরদাঁড়ি হয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে বঙ্গোপসাগরে।

খুব ছোটকালে আনু গরুর গোসল করানোর জন্যে কপোতাক্ষে গেছে কয়েকবার। গলা পানিতে নামিয়ে গরুর গোসল করানোর সেই যে মজা— তার আনন্দই আলাদা। গরুর সারা শরীর ছোবড়া দিয়ে ভাল করে ঘঁষে-ডলে তার গায়ে পানি ছিটিয়েও শেষ রক্ষা হয়না। হাত দিয়ে পরম যত্নে ঘঁষতে হয় গরুর দেহ। তারপর তার মাথাটা ঠেসে ধরে পানিতে চোবাতে হয়। বেশ কয়েকবার। এই দৃশ্য সে দেখেছে অনেকবার। এসব কাজের সাথীও হয়েছে মহা আনন্দের সাথে।

একটু বড় হবার পর সানোয়ার আর সে— দুইভাই মিলে গরুকে গোসল করিয়েছে কয়েকবার।

গ্রামের ছেলে। এসব অভিজ্ঞতা না থাকলে চলবে কেন?

আনুর বয়স তেমন কিছু নয়। তবু এই বয়সে সে লাঙ্গল চষতে শিখেছে। শিখেছে ক্ষেতে মই দিতে, খেজুর গাছ থেকে শীতকালে রসের ভাঁড় পাড়তে। ধান কাটা, ক্ষেত নিংড়ানো– এসব তো মামুলি কাজ। গরুর জন্যে বাঁশের মাথায় উঠে বাঁশপাতা সংগ্রহ করতে, জাওনা কাটতে গিয়ে কিংবা পৌষ-মাঘ মাসে, শীতের সময় আমন ধান কাটতে গিয়ে কতবার যে তার হাত কেটে গেছে তার কোনো হিসাব নেই।

একবার এক শীতের সময়, খুব ভোরে আমন ধান কাটতে গিয়েছিল সে। সাথে ছিল তার ভাই সানোয়ার, তালেব দাদা আর ছিল ওসমান চাচা।

ওসমানকে চাচা বললেও মূলত তারা পরস্পর খেলার সাথী। প্রায় সমবয়সী। ঠিক বন্ধুর মত। তো সেদিন, সেই শীতের সকালে কী যে হলো! ধান কাটতে কাটতে হঠাৎ করে আনুর বাম হাতের শেষ দুটো আঙ্গুল কেটে গেল কাঁচিতে।

প্রথমে তো সে কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ কাঁচিটা ছিল নতুন করে ধার কাটানো। তাও যে সে কামার নয়, গদাই কামারের হাতের কাজ।

গদাই কামারের কাজের সুনাম খুব।

ওসমানের সাথে আনুও গিয়েছিল ঐ কাঁচি আনতে কামার পাড়ায়।

www.pathagar.com

হাফরের কাছে বসে আনু এক দৃষ্টিতে দেখছিল কেবল গদাই কামারের কাজের কৌশল। চোখে না দেখলে সেই শৈল্পিক দৃশ্য কাউকে বলে বুঝাবার মত নয়।

গদাই কামারের ধার কাটানো সেই কাঁচি। ধারতো থাকবেই।

যখন আঙ্গুল কেটেছিল তখন আনু বুঝতে পারেনি। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। পরে যখন রক্ত ফিনকি দিয়ে বার হচ্ছিল তখন চমকে উঠলো। তালেব গাজীকে বললো : দাদা, হাত কাটে গেচে।

—হ্যা, কইস কি?

ছুটে এলেন দাদা, ছুটে এলো মিয়াভাই আর ওসমান চাচাও। দাদা বললেন, এই সানু দাঁড়ায় দেখচিস কি! দৌড় মারে কিচু দুব্বো ঘাস তুলে আন।

আনুকে নিয়ে তখন সবাই ব্যস্ত।

সানু বোগলে কাঁচিটা এঁটে ধরে দুই হাত দিয়ে দুর্বা ঘাস ওঠাচ্ছে আর সমানে চিবোচ্ছে।

শীতের শিশিরে ধুয়ে গেছে আলের ওপর লতিয়ে ওঠা ঘন সবুজ ঘাস।

সানুর গালভর্তি সকালের সেই নরম সবুজ ঘাস। চিবোচ্ছে গরুর বাছুরের মত। তারপর গাল থেকে বার করে দিচ্ছে দাদার হাতে। দাদা দুটো আঙ্গুলের মাথায়, কাটা জায়গায় চেপে ধরে আছেন চিবানো ঘাস দিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল রক্ত।

আনুর আঙ্গুল দুটোয় সেই কাটার চিহ্ন এখনো আছে।

এখনো বেঁকে আছে তার বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলের মাথাটা।

শীতের ভোর, কাঁধে বাঁক আর খালি ভাঁড়। পুবের মাঠে যাচ্ছে গাছ পাড়তে।

গাছ পাড়তে যাচ্ছে আনু।

তার মানে খেজুর গাছ থেকে রসের ভাঁড় পেড়ে বাঁকে করে আনবে সে।

টাটকা খেজুরের রস। তার স্বাদই আলাদা।

সেঁজো রসের স্বাদটা আরও বেশি। অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে যে রসটা ভাঁড়ে জমা হয়। এই সেঁজো রস আর নাড়ার আগুনে পোড়ানো ছোলা-বুট যদি একসাথে খাবার সুযোগ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

www.pathagar.com

উহ! তার কোনো তুলনাই চলেনা। কলাটা মনে হতেই জিভটা ভিজে যায় লোভে।

পুবের মাঠে প্রচুর খেজুর বাগান।

পাড়ার প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গাছ আছে।

মাঠভর্তি হরিৎ বিশেষ করে আলু, মস্তরি ও শর্ষের ক্ষেত।

শর্ষে গাছের হলুদ ফুল।

ক্ষেতে নামার সাথে সাথে ভিজে শিশিরের সাথে শর্ষে ফুল লেপ্টে যায় পায়ে। পায়ের দৃশ্য তখন অন্য রকম। গাছ থেকে গাছে।

রস পাড়া শেষ হলে আবার বাঁকে করে আনে বাড়িতে। এটা আনুর দায়িত্ব।

প্রতিসকালে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও খালি পায়ে বাঁক নিয়ে মাঠে যাওয়া— সে এক অন্যরকম আনন্দ। খেজুর গাছের মাথায় উঠে ডগমগে লাল সূর্য দেখা যায়।

দেখা যায় গ্রামের বহুদূর পর্যন্ত।

রস আনার পর মা কাঁসার গ্লাস ভরে পেটভরে খেতে দেন।

যে গাছের রস সবচেয়ে বেশি মিষ্টি সেটাই খাবারের জন্যে রাখা হয়। আনু জানে, কোন্ গাছের রস মিষ্টি বেশি।

রসের ভাঁড় নামিয়ে ওই ভাঁড়টায় মাটির গোটা দিয়ে টিক চিহ্ন এঁকে রাখে সে। বিশ-ত্রিশটা ভাঁড়ের ভেতরও মা সহজে খাবার রসের ভাঁড়টা আলাদা করতে পারেন।

গ্রামের রেওয়াজ আছে, নতুন রসের পায়েস করা। রেওয়াজটা অন্য কারণে নয়। ওতে মজাটা বেশি বলেই। নতুন রসের পায়েস কিংবা নতুন গুড়ের পাটালি যে খেয়েছে, সেই কেবল এর স্বাদ এবং গন্ধটা বুঝতে পারবে।

ভরা বর্ষাকালেও আনুর উৎসবের কোনো শেষ নেই।

নোচুর কুড় আর আন্দ্যোর বিলে বর্শা ফেলে মাছ ধরার কথা কখনো ভোলা যায় না। ছিপ দিয়ে খোপা নাচানো— তাও মন্দ নয়।

কিন্তু মাছ ধরার দিক দিয়ে তার চেয়ে সানুই বেশি ওস্তাদ। তাকে মাছুড়ে বললেও ভুল হবে না।

www.pathagar.com

সেবার কোচুর বিলের একটি কুয়োয় নেমে সানু ডুবের পর ডুব দেয়া শুরু করলো। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে আনু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভায়ের দিকে। কুয়োভর্তি পানি। পানিতে পালা দেয়া। ডুব দেয়াও সহজ কাজ নয়। কিন্তু মাছুড়ে বলে কথা!

সানু একবার ডুব দিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে। সে আর ওঠে না। পাড়ে অস্থির আনু। কী ব্যাপার, ম্যাভাই ওঠেনা ক্যান্!

হঠাৎ ঝুপ করে পালার ভেতর থেকে ডলফিনের মত মাথা বাড়িয়ে দিল সানু। তার দমটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। কারণ সানুর ডান হাতটা তখন একটি বড় বোয়াল মাছের কানকির ভেতর।

দু:সাহসী সানু। ডুব দিয়ে বোয়াল মাছটা ধরে এভাবে মাছের কানকির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তুলে এনেছে পানির ওপর।

ভরা কুয়োর গায়ে গায়ে, চারপাশে গর্ত আছে। সেই গর্তের কোনোটায় থাকে জিউল মাছ। সানু খুব ঝানু মাছ শিকারি। পানির ভেতর সে গর্ত খোঁজে। একটা পেলেই হলো। সাপ আছে, না মাছ আছে— এসব সাত-পাঁচ না ভেবে সোজা হাত ঢুকিয়ে দেয় গর্তের ভেতর। গর্তের ভেতর জিউল মাছ। খলবল করে ওঠে।

সানু কেমন দক্ষ শিকারীর মত ডান হাতের মুঠো ভরে বের করে আনে মাছ। বাম হাত গর্তের মুখে। কুয়োর ভেতর থেকে সেই মাছ ছুড়ে মারে কুয়োর পাড়ে। আনু ধরতে গিয়েও ফেল মারে। খুব কষ্টে ধরে ধরে খারুইতে ভরে।

গর্তের মাছ শেষ করে যখন সানু ডাঙায় ওঠে। তখন তার হাতদুটো জিউলের কাঁটার খোঁচায় রক্তে একাকার।

ভায়ের হাতে ক্ষত আর রক্ত দেখে আনুর চোখের পানি টলমল করে ওঠে।

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই সানুর। কেমন বিজয়ীর বেশে আনন্দে ডগমগ।

সারা গায়ে কাদা-মাটি। মাছভরতি খারুই।

বাড়ি ফিরলে আব্বা-মা খুশি হন। কিন্তু আবার ধমকও খেতে হয় অতি

www.pathagar.com

দু:সাহসের জন্যে।

সেই যে একবার! ভরা বর্ষার মৌসুম।

সানু আর আনু— দুই ভাই গিয়েছিল কপোতাক্ষ পার হয়ে কায়েমকোলা। দাওয়াত খেতে।

দুপুরে খাবার পর শুরু হলো বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি।

থামার কোনো নাম-গন্ধও নেই।

এদিকে সময় গড়ায়। বিকেল হয়ে গেছে। তখনও তারা অপেক্ষা করছে। বৃষ্টি থামছেনা।

মহা চিন্তায় পড়লো দুইভাই।

এখন কি করা যায়?

আনু বললো, ম্যাভাই, কি করবি, পানিতো থামেনা।

– তাইতো ভাবতিচি। থাকি যাব না কি!

– মাতা খারাপ? তুই জানিসনে, বাড়িতে ছাড়া আমি রাত কাটাতি পারিনে!

– সেও তো এটাটা সমস্যা। তালি একন কি করা যায়! সন্দে তো হয়ে অ্যালো।

– এক কাজ করি ম্যাভাই!

– কী?

– চল্, ভিজতি ভিজতি বাড়ি যাই।

– এতডা পত– পারবি তো?

– পারবো না ক্যান্। নিচ্চয় পারবো। যাবি?

– তুই যকন কচ্চিস, তকন চল্।

– ব্যাস্!

দুইভাই কাছা এঁটে সেই বৃষ্টির মধ্যে শেষ বিকেলে দৌড় শুরু করলো।

কায়েমকোলা থেকে বাঁকড়া, তাদের বাড়ির দূরত্ব কম করে হলেও পাঁচ মাইল। দৌড়েই তারা পথ অতিক্রম করছে।

রাস্তায় তেমন কোনো মানুষজন নেই। দৌড়ুতে দৌড়ুতে তারা কপোতাক্ষর ঘাটে এসে থমকে দাঁড়ালো।

সর্বনাশ! নৌকা তো ওই পারে।

www.pathagar.com

বর্ষার কারণে কপোতাক্ষ ফুলে ফেঁপে বিশাল হয়ে পড়েছে। দুকূল প্লাবিত। থউ থই পানি। তেমনি আবার স্রোত।

হাটবার হলেও কথা ছিল।

এই একটানা বৃষ্টির মধ্যে নেহায়েত ঠেকায় না পড়লে কেউ বেরুচ্ছে না। ওপার থেকে কাউকে আসার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

এখন নদী পার হওয়া যায় কীভাবে? ভারি সমস্যার কথা।

কিছুক্ষণ ভাবলো দুইভাই।

সানু বললো, আনু, তুই এই পার থাক। আমি সাঁতরে গে ওপার থেকে নৌকা আনি।

– না ম্যাভাই। তুই এপার থাক। আমি যাই।

– পাগল! তুই না ছোট্ট মানুষ। আমি তো বড়। আমি যাই।

– না ম্যাভাই, আমি যাব। তুই যদি সোঁতের মদ্যি পানিতে ডুবি যাস!

– আর তুই? তুইতো আমার চেয়েও ছোট। তুই ডুববিনে?

– না। আমি ঠিকই যাতি পারবো।

– তুই পারলি আমি পারবো না ক্যান্! কতা বাড়াসনে। তুই থাক আনু, আমি যাচ্ছি।

সানু ঝাঁপ দিল কপোতাক্ষে।

বেশ কিছু দূর সাঁতরে যাবার পর সে পেছনে ফিরলো। সেকি! আনু তুই! তুইও আসতিচিস? তোর নে আর পারা যাবেনা।

ততোক্ষণে আনুও সাঁতরে সানুর সমান সমান উঠে গেছে।

প্রবল স্রোতের ভেতর তারা সাঁতরিয়ে পার হচ্ছে কপোতাক্ষ। দুইভাই যখন কূলে এসে উঠলো, তখন তারা খুবই ক্লান্ত।

কেবলই হাঁফাচ্ছে পাড়ে বসে বসে।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা উঠে দাঁড়ালো। তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি। সন্ধ্যাও আগত। চারদিকে কেমন অন্ধকার।

বাকি পথটাও তারা ধীর লয়ের দৌড়ের মাধ্যমে পেরিয়ে এলো। দৌড়ুতে দৌড়ুতে সানু বললো, আনু, খবরদার! নদী সাঁতরাবার কতা যেন আব্বা জানতি না পারে।

www.pathagar.com

– ক্যান ম্যাভাই?
– তালি কিন্তুক কপালে দুক্কু আচে।
– তা ঠিক কইচিস ম্যাভাই। তুই-ও কসনে। আমিও কবোনা।
– মনে থাকে যেনো।
– থাকপ্যানে। তুই চিন্তা করিসনে।

অবশেষে তারা যখন বাড়িতে পৌঁছুলো, তখন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে গেছে।

আব্বা মাগরিবের নামাজ পড়ে অজিফা করছেন। মা রান্নাঘরে।

কাঁচা ডালপালা দিয়ে রান্না করতে গিয়ে মা'র দুইচোখ ধোঁয়ায় আর পানিতে একাকার। ফুঁ দিতে দিতে ক্লান্ত। শুকনো কাঠ নেই। কদিন থেকে বৃষ্টি। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। কী আর করবে? হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই চুলায় দিয়েছেন।

এভাবে রান্না করা আর সম্মুখ সমরে জেহাদ করা এক কথা।

বৃষ্টির মধ্যে রান্না ঘরের চাল ফুঁড়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে।

সানু আর আনুর উপস্থিতি মা টের পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না।

মা ছাড়া আনুর এক মুহূর্তও চলে না। একটা বেলা তাকে না দেখার কষ্ট হাজার বছরের কষ্টের মত। সে ভেজা শরীর নিয়ে ছুটে গেল রান্না ঘরে।

– মা, আমরা আইচি।

মা চোখ মুছে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন, সে কি? এলি কীভাবে?

– কেন, ভিজে ভিজে!
– সে তো দেখতে পাচ্ছি। তা এই কহর মাথায় না এলে কি হতো না?
– হবে কীভাবে?
– কেন, তোরা ওখানে থেকে যাতিস।
– তোমার মাতা খারাপ?
– কেন?
– তুমারে থুয়ে কি আমি কোনো জাগায় থাকতি পারি?

মা একটা ধমক দিলেন, খুব দরদের ধমক। মায়ের সেই ধমকের মধ্যে আদর, আবেগ আর অনুভূতি ছিল খুব গাঢ়। বললেন, এখন যা। তাড়াতাড়ি গা-হাত-পা ধুয়ে ঘরে ওঠ। সানু কই?

– সে তো পুকুরে গেচে।

www.pathagar.com

– তুইও যা।

পুকুর থেকে গোসল সেরে দুইভাই বারান্দায় উঠেছে।

মা রান্না ঘর থেকে চিৎকার করে বললেন, ভাল করে শরীর-মাথা মুছিস। তা-না হলে আবার জ্বর-টর বেধে যেতে পারে।

বৃষ্টির মাত্রাটা একটু কমে এসেছে।

মায়ের কথাটা বৃষ্টির শব্দে একেবারে হারিয়ে গেলনা। তারা ভালভাবেই শুনতে পেয়েছে। মায়ের আওয়াজ বলে কথা! ওই আওয়াজ আটকে রাখে সাধ্য আছে কার? সন্তানের আওয়াজও মা শুনতে পান ঠিক সেইভাবে। বহুদূর থেকেও। শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও।

আব্বার অজিফা শেষ হয়েছে।

তিনি ঘুরে বসেছেন সানু-আনুর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, কি, ব্যাপার! তোমরা বৃষ্টির মধ্যে চলে এলে কেন? থেকে গেলেই তো পারতে।

সানু-আনু দুজনেই আব্বার দিকে তাকালো। তাদের চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন?

বাপ-মায়ের চোখ থেকে কোনো কিছু লুকানো অসাধ্য ব্যাপার। হয়তো অনেক সময় তারা চুপ থাকেন। কিছু বলেন না। তার অর্থ, তারা বোঝেননি তা নয়। বুঝেও চুপ থাকেন। কিংবা বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সানু-আনুর বুকটা কেঁপে উঠলো আব্বার তাকানোর ভঙ্গি দেখে। তবে কি তারা ধরা পড়ে যাচ্ছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে এলে?

– এই তো। অ্যাল্যাম আরকি।

– তাতো ঠিক। ওপথে তো কোনো গাড়ি-ঘোড়া নেই। হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। হাঁটছো তো, নাকি দৌড়াইছো?

সানু চুপ আছে। আনু বললো, এত পত কি দৌড়ে আসা যায়?

– কখন বেরিয়েছ?

– দুপুরে খাবার পরে।

– নৌকা কি ঘাটে ছিল?

উত্তর দিতে গেলেই এবার ধরা পড়ার সম্ভাবনা। ধরা পড়ার আগেই উদ্ধার করলেন মা। বললেন, ছেলে দুটো কষ্ট করে বাড়ি ফিরলো। ওরা একটু বিশ্রাম নিক। তারপর যত খুশি প্রশ্ন করবেন। দেখছেন না বাচ্চাদুটো

www.pathagar.com

কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!

মায়ের কথাই ঠিক। ওরা তখন ভীষণ ক্লান্ত। আব্বা যে বুঝতে পারেননি তা নয়। প্রশ্নের মাধ্যমেই তিনি সত্যটাকে উদ্ধার করতে চাইছিলেন। তিনি জানেন, ছেলেরা মিথ্যা বলবে না। ধরা পড়তেই তো গিয়েছিলো।

পরদিন স্কুল বন্ধ।

লেখা-পড়ার চাপ তেমন একটা ছিল না। আব্বাও ছুটি দিলেন। বললেন, নাও, এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। কাল সকালে পড়বে।

সানু আর আনু আব্বার সাথে খেতে বসেছে। রান্না ঘর থেকে মা খাবার এনে দিচ্ছেন। তিনি ভিজে গেছেন। মাথার পরে একটা আলাদা কাপড় দিয়ে রেখেছেন।

ওই কাপড়ে কি আর বৃষ্টির পানি আটকায়?

আম্মা এভাবে আরও কতরাত পর্যন্ত ভিজবেন তার কোনো ঠিক নেই। সব কাজ শেষ করে তারপর তিনি ঘরে ওঠে কাপড় পাল্টাবেন।

মায়ের কষ্টে আনুর বুকটা ভেঙ্গে যেতে চায়। কিন্তু করবার কিছুই নেই। বাড়ির সবাই এত করে বলে, একটু কম কাজ করতে, কিন্তু তিনি শুনবেন না। যখনকার কাজ তখন তা না করলে তিনি স্বস্তিই পাননা।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সানু-আনু শুয়ে পড়েছে আব্বার বিছানায়। আব্বার দুই পাশে তারা দুই ভাই।

বারান্দার পুবপাশে দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটি থালা-বাসন পেতে রেখেছেন মা। চাল দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। সেই পানির ধারায় কাঁচা বারান্দার মাটি ফেটে কয়েকটি গর্ত হয়ে গেছে। চাল থেকে যখন বৃষ্টির পানি কাঁসার বাটিতে আছড়ে পড়ে, তখন চমৎকার একটি শব্দ হয়। ধ্বনিটা কানে বহুক্ষণ পর্যন্ত বাজতে থাকে।

সানু-আনুর শরীরটা ক্লান্ত। এত দীর্ঘ পথ দৌড়ে আসা, সাঁতরে কপোতাক্ষ পার হওয়া— কম ধকলের ব্যাপার নয়। সানু ঘুমিয়ে পড়েছে। আনু শুয়ে শুয়ে তখনও চালের বাতা বেয়ে বাটিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টির ফোঁটার সেই শব্দ শুনছে।

আব্বা গভীর মমতায় আনুর মুখের ওপর হাত রাখলেন।

সম্ভবত তার ধারণাটাকেই তিনি ঝালিয়ে নিতে চান। জানতে চান তারা

www.pathagar.com

সাঁতরে কপোতাক্ষ পার হয়েছে কি-না।

আনুওতো কম চালাক নয়। পরিবেশটা পাল্টাবার জন্যে বললো, আব্বু!

– বলো।

– একটা কবিতা শোনাবেন?

– শুনবে?

– হ্যা।

– শোনো। আবৃত্তি শুরু করলেন আব্বা :

মাঠের পরে মাঠ চলেছে বিলের পরে বিল
ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে, নীল আকাশে চিল।
নদীর বুকে পালের নাও
এসব রেখে কোথায় যাও?
একটু থামো এই এখানে বাঁক ফেরানো ঘাটে,
এই দেখোনা খেলার সাথী— বকের সারি হাঁটে।
পুবের মাঠে কাওন আছে
মটরশুঁটি বাদাম আছে
ঘাসের বুকে ঘুমায় জাদু শিশির ভেজা খাটে।
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
তার চেয়ে যে অনেক খাঁটি
দুধের বাটি উপচে পড়া শস্য–শ্যামল দেশ,
সাতটি রঙে বাঁধা আমার সোনার বাংলাদেশ।

কবিতা শুনতে শুনতেই আনু ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের ভেতর সে কেবলই দেখছে মাঠের পরে মাঠ। সবুজ আর সবুজে ভরা ক্ষেত। মাঠের পরেই কপোতাক্ষ। দুই ভাই মিলে কাছা এঁটে নেমে গেছে কপোতাক্ষে। সাঁতরে নদী পার হচ্ছে। ওপারের ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। মাঝি নেই। না থাক। তারা সাঁতরিয়েই তো কপোতাক্ষ পাড়ি দিচ্ছে।

তাদের আর নৌকার দরকার কী?

www.pathagar.com

আঁধার ফুঁড়ে আলোর গোলক

আকাশটারে মুঠোয় ভরে
যাচ্ছি আমি অনেক দূরে।—

আনু গিয়েছিল কলারোয়ায়। সানু লজিং থাকে সেখানে।

আনু পৌঁছুলো বিকেলে। দশ মাইল কম কথা নয়।

এতপথ পায়ে হেঁটে গেছে। ভাইকে কদিন থেকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। শুক্রবার এলে সে মাকে বলে রওয়ানা দিল একরকম জিদ করেই।

সময়টা বর্ষাকাল।

www.pathagar.com

আনু ভাইকে দেখে তার বুকটা জুড়িয়ে নিল।

আহ! কতদিন সে তাকে দেখেনি। কতদিন হয়নি তাদের এক সাথে ধান কুড়ানো, ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে ইঁদুর বের করা, কতদিন হয়নি ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে মুঠো মুঠো ধান তোলা, এমনকি ছিপ কিংবা বর্শা ফেলে মাছ ধরা। আনুর খুব কষ্ট লাগে।

এসব ছিল এক সময় তাদের প্রায় প্রতিদিনের কাজ। কাজের মধ্যে আরও ছিল আম কুড়ানে আর খুব ভোরে তাল কুড়ানো।

তাল কুড়ানোর কথা মনে হলেই এখনো তার শরীরটা শিউরে ওঠে। তখন উঠতো না

কী এক সাহস আর উত্তেজনায় তারা দুইভাই খুব ভোরে, প্রায় অন্ধকারে ঘুম থেকে জেগে যেত। তারপর লুঙ্গিতে কাছা এঁটে দুইভাই খালি গায়ে, খালি পায়ে বেরিয়ে পড়তো বাড়ির আর কাউকে না জানিয়ে।

গাজী পাড়ার পিছনে ঘন বাঁশবাগান।

বাগানের নিচে সারি সারি কবর। নতুন আর পুরনো কবর মিলে-মিশে সে এক গা ছম-ছম করা অবস্থা। কোনো কোনো কবর ধসে গিয়ে বিশাল গর্ত হয়ে গেছে। পুরো কবরপ্রমাণ জায়গা গর্ত!

সেইসব কবরের গর্তের দিকে তাকালে দিনের বেলায়ও ভয়ে বুকটা হিম হয়ে ওঠে। কোনো কোনো কবরের বাঁশগুলো পড়ে আছে কবরের ভিতর।

এই সব কবর এবং বাঁশ বাগান ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল লম্বা কয়েকটি তালগাছ।

গাছ থেকে রাতে ঝুপঝাপ করে পড়ে পাকা তাল।

এসব তালের অধিকাংশই পড়ে কবরের গর্তে। দিনের বেলায়ও দুএকটা পড়ে। রাতের বেলা যেগুলো পড়ে সেগুলো কেউ আর কুড়োতে আসেনা ভয়ে।

কিন্তু আনু আর সানু কেমন বীরের মত নির্ভয়ে ভোর রাতে বেরিয়ে সেই কবরের পেট থেকে কুড়িয়ে আনে ঝুড়িভর্তি তাল।

তাল কুড়ানোর উদ্দেশ্য কিছুটা তালের শাঁসের লোভ আর বাকিটা টান টান উত্তেজনার আনন্দ।

প্রতিদিন তারা তাল কুড়িয়ে আনে বাড়িতে।

www.pathagar.com

কুড়ানোর তাল রাখার জন্যে বাঁশ কঞ্চি দিয়ে একটি মাচাও তৈরি করেছে। ওখানে জমা করে। কিছু দিন পরে তালের প্রতিটি আঁটি থেকে বেরিয়ে আসে গজ। গজগুলো ঝুলে পড়ে মাচার নিচ দিয়ে।

দেখতেই মনটা ভরে ওঠে। যখন ভাল করে গজ বেরিয়ে যায়, তখনি ওগুলো কেটে ভেতর থেকে মিষ্টি আর সুস্বাদু শাঁস বের করে খায় তারা। পাড়ার অন্য ছেলেদেরকেও বিলায়।

কিন্তু বহুদনি থেকে এই কাজটিও আর হয়না। ভাবতেই আনুর মনটা খারাপ হয়ে যায়।

শেষ বিকেল। লজিং বাড়ির চাঁচের বারান্দায় বসে তখনও বই পড়ছিল সানু। সামনেই তার আইএ ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষায় তাকে খুব ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এটা তার পণ। একমনে লেখাপড়া করে যাচ্ছে সে।

আনুকে দেখে অবাক হলো সানু। জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার! হঠাৎ যে চলে এলি?

ভায়ের এমন প্রশ্ন শুনে আনুর খুব কষ্ট লাগলো। তাহলে আমার উপস্থিতি কি সে কামনা করেনি? ভাবলো আনু।

এতটুকুতেই তার কান্না এসে গেল।

এতটা স্পর্শকাতর হলে সমাজ সংসারে যে চলা যায়না, আনু তখনও সেটা বুঝে ওঠেনি।

সানু আবার প্রশ্ন করলো, কীরে! বাড়ির সব খবর ভাল তো? আয়, কাছে আয়।

আনু এবার কাছে, খুব কাছে চলে এলো ভায়ের। বললো, বাড়ির সবাই ভাল। আমার মনটাই কেবল খারাপ ছিল তোর জন্যে। লেখাপড়ায় মন বসছিল না। ব্যাস, চলে এলাম। তুই মন খারাপ করেছিস?

– কেন?

– আমি এসেছি বলে।

– ধ্যুর, গাপল কোথাকার !

– তবে ওভাবে আমার দিকে তাকালি কেন?

– কীভাবে?

www.pathagar.com

– আমি আর বুঝিনে মনে করিস!

– তোরে নিয়ে এই এক সমস্যা। সব সময় একটু বেশি বুঝিস, বাড়িয়ে বুঝিস।

– বল্ আমার ধারণা মিথ্যে!

– সত্যি-মিথ্যে নিয়ে কথা নয়রে দাদু! কথা হলো, অত কিছু ভাবতে হয়না।

– আমি কি আর ইচ্ছে করি ভাবি?

– ভাবিস তো।

– না, আমাকে ভাবতে বাধ্য করে। আমি তোদের না-বলা কথা বা চিন্তাটাও যে বুঝতে পারি।

– ওটাই তো তোর বড় সমস্যা।

– বুঝতে পারলে যদি সমস্যার কারণ হয় তাহলে আমিই বা কি করতে পারি বল!

– শুধু শুধু কষ্ট পাস এ জন্যে।

– আসলে তাই ম্যাভাই। বুঝেও তো কিছু করতে পারিনে। শুধু শুধু কষ্ট পাই। আর এজন্যে খুব একা হয়ে যাই।

– তার মানে?

– মানে বুঝলি নে? যেখান থেকে কষ্ট পাই, তুই বল্ জান গেলেও কি আমি আর তার ধারে কাছে যাই? এভাবেই তো আমি একা হয়ে পড়ি।

– আমিও কি তোকে কষ্ট দিই?

– দিসনি। কিন্তু দিতে কতক্ষণ!

– যা!

– সত্যি বলছি ম্যাভাই, তুই-ও যদি আমার কষ্ট দিস তো দেখবি, তোর ধারের কাছেও আমি আর ঘেঁষবো না।

– পাগল!

পরম আদরে সানু ছোটভাইকে জড়িয়ে ধরলো। আয়, চল ভেতরে যাই।

মাগরিবের নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে দুই ভাই হঠাৎ চমকে উঠলো।

ঝড় শুরু হয়েছে। একটু পরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। মুষলধারে নামছে বৃষ্টি। একটানা রাত আটটা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

ঝড়ের দাপট কমে গেছে। তবে কিছুটা বাতাস আছে। বৃষ্টির ধারও কমে এসেছে। টিপ টিপ পড়ছে ক্রমাগত।

সময়মত দুইভায়ের রাতের খাবার এলো ভেতর থেকে।

আনুর খেতে খুব লজ্জা করছে।

হাজার হোক, এরা তো আর আত্মীয় নয়। নয় আপন কেউ। সে ভাতের থালা সামনে নিয়ে ইতস্তত করছে।

সানু বললো, কী রে, চুপ করে বসে আছিস ক্যান। খেয়ে নে।

– ম্যাভাই?

– কী হলো!

– আমার খুব লজ্জা করছে।

– ছি! কী যে বলিস না।

– তবু।

– তবু আবার কি?

– এরা তো আমাদের কেউ না। নয় কোনো আত্মীয়। খাই কেমন করে, বলতো?

– পাগল নাকি! পর হতে যাবে কেন? আরে, মানুষ কখনো পর নয়। সবাই আপন। এখানে যে আছি, এদের আদর-যত্ন পাচ্ছি, আন্তরিকতা না থাকলে কি এটা সম্ভব হত? দেখলি না, গতমাসে এই বাড়ির মালিক তার ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন? আপন মনে না করলে কেউ কি এভাবে যায়? নে, এখন চুপচাপ খা। আমার আবার পড়াশুনা করতে হবে।

আনু খাচ্ছে। তবে তার মধ্যে সেই লজ্জা, সেই কুণ্ঠাবোধ তখনও কাজ করছে।

খেতে খেতে সানু জিজ্ঞেস করলো, তারপর বল, তোর লেখা-পড়া কেমন চলছে?

– ওই কোনো রকম।

– কোনো রকম লেখা-পড়া করলে কি আর আমাদের চলবে?

– কিন্তু কি করবো! তুই কাছে না থাকলে যে আমার পড়ায় মন বসেনা।

www.pathagar.com

– তবুও পড়তে হবে দাদু! না পড়লে আমাদের হবেনা। অন্যদের কথা ভেবে লাভ নেই। তুই কেবল মনে রাখবি লেখা-পড়াটাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সম্পদ।

– তুইও দেখি আব্বুর মত কথা বলা শিখেছিস!

– শিখবো না কেন? শিখেছি ঠেকে। দেখ, মা আর আব্বু আমাদেরকে মানুষ করার জন্যে কত কষ্টটাই না করেন। নিজেরা না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়ান। সংসারে হাজারো অভাব। তা সত্ত্বেও আমাদেরকে লেখা-পড়া শিখতে বাধ্য করেছেন। পাড়ার অন্য বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ। সবাই তাদের ছেলেদেরকে দিয়ে আয় করায়। তাদের সকলের আয়ে তারা দুবেলা দুমুঠো পেটভরে খেতে পায়। আর আমাদের বাপ-মা আমাদেরকে দিয়ে ওসব আয়ের চিন্তা না করে কেবলই কষ্ট করে যাচ্ছেন।

কথা বলতে বলতে সানুর চোখদুটো ভিজে গেল।

হাজার হোক সেই তো বড়।

সে তো আনুর চেয়ে ক'বছর আগে থেকে অভাবের সাথে পরিচিত। সানুর ভেতর তো একটা বোধ এতদিনে পুষ্ট হয়েছে।

সে আবার বললো, পাড়ার দুষ্ট ছেলেদের সাথে মিশে সময় নষ্ট করিসনে। মন দিয়ে লেখা-পড়া কর। কাজে লাগবে। জানিস তো, আমাদেরকে নিয়ে আব্বা-মার অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা!

– জানি তো।

– জানলেই তো শুধু চলবে না। তাদের আশা-স্বপ্ন সফলও করতে হবে।

– আমরা কি তা পারবো?

– কেন নয়?

– কীভাবে?

– শুধু ভাল করে লেখা-পড়ার মাধ্যমে। আমাদের কাছে তো তারা এখন এর বেশি আর কিছুই চাচ্ছেন না। দেখনা, আমাদেরকে কেবল মানুষ করার জন্যে আব্বু গরুও পালতে চান না। খুব জোর করে মা কটা ছাগল পোষেন। তাও আমাদের লেখা-পড়ার খরচ চালানোর জন্যে। আব্বু গরু কেন পালতে চান না, জানিস?

– জানি।

www.pathagar.com

– বলতো?

– আব্বুর ধারণা হলো, দুটো গরু পালতে হলে ছেলে দুটোকেও গরু বানিয়ে ফেলবেন। কারণ গরুর ঘাস, জাওনা কাটাতে, দেখাশুনা করতে মানুষ লাগে, সময় ব্যয় হয়, তাই।

– ঠিক বলেছিস। আমাদেরকে গরু বানাতে চাননি বলেই তিনি গরু পালেন না। সুতরাং বুঝে দেখ। আব্বুর সম্পদ বলতে কেবল আমরা, এই দুটো ভাই।

– বুঝি ম্যাভাই।

– বুঝলেই ভাল। আর বুঝবি না কেন? বুঝতে যে আমাদের হবেই। আমাদের অবস্থা তো আর অন্য দশজনের মত নয়।

হঠাৎ করেই যেন সানুর সামনে আব্বা এবং মায়ের ছবিটা ভেসে উঠলো। হাতের ভেতর ভাতের লোকমা। মুখে দিতে গিয়েও থেমে গেল। তার সামনে ক্ষুধার্ত, কষ্টে জীর্ণ, দুমড়ানো মুচড়ানো দুটো অসম্ভব আলোকিত মানব-মানবীর চেহারা ভেসে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, আব্বা-মা কেমন আছেরে?

– ভাল। তবে আব্বুর বুকের ব্যথাটা বেড়ে গেছে। সাথে কাশিও।

– আর কি রক্ত উঠেছিল?

– না। তবে কাশির যে ভাব তাতে করে ভাল মনে হচ্ছে না।

– ওষুধ খাচ্ছেন?

– খাচ্ছেন। বাকসার পাতা, দুবলো ঘাসের রস, লতা-পাতা আর গাছের ছাল দিয়ে বানানো ওষুধ।

সানু বুঝতে পারে সবই। অর্থের অভাবে ওষুধ কেনা হচ্ছে না। বুঝতে পারে আব্বুর খুব কষ্ট হচ্ছে।

আনুও কি বোঝেনা এসব কষ্টের কথা? বোঝে। কারণ সেও যে অনাহার আর নিত্য অভাবের সাথী। কিন্তু সেসব কষ্টের কথা বলে ভাইকে আর ভারাক্রান্ত করে তুলতে চায়না। তার চোখ দুটোও ছল ছল করে উঠলো। ভাতের থালার দিকে তার দৃষ্টি। জানে, ভায়ের চোখের দিকে এখন তাকালে দুইভাই আর কান্নাকে চেপে রাখতে পারবে না। সানু জোরে একটা দম ফেললো। সাথে আনুও।

www.pathagar.com

একটু দ্রুত খাওয়া শেষ করলো সানু। বললো, আনু, শোন দাদু ভাই! আমি স্টাইপেণ্ডের টাকাটা পেয়ে গেছি কাল। আজ বাড়িতে যেতে পারিনি কারণ আগামী কাল আমার জরুরি ক্লাস আছে। সে যাক! তুই যদি রাজি থাকিস তো আমরা এখনই টাকাটা নিয়ে বাড়িতে রওয়ানা দিতে পারি। আজ রাতে গেলে কাল এসে আবার আমি ক্লাস করতে পারবো। যাবি?

টাকাটা কাল আনুর কাছেও দিতে পারতো। কিন্তু টাকাটাই এখন মুখ্য বিষয় নয় সানুর কাছে। আব্বাকে না দেখে সত্যি বলতে সে আর থাকতে পারছেনা। আনু জানে, সে রাজি হলে দুইভাই যে কোনো ঝুঁকিই নিতে পারে। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের মধ্যে এক রকম রোমাঞ্চ আছে। সে আগ-পাছ না ভেবেই বললো,

– ঠিক আছে, চল্।

– সত্যি?

– হ্যা।

– তাহলে আর দেরি করা যাবেনা। দাঁড়া, আমি একটু দ্রুত গুছিয়ে নিচ্ছি।

দ্রুত বলতে খুবই দ্রুত হলো। গায়ে শুধু একটা জামা পরে নিল।

লজিং-বাড়ির মালিককে বলতেই তিনি অবাক হলেন, সেকি! এত রাতে তোমরা যাবে কীভাবে?

– আমরা পারবো চাচাজান।

– কী করে পারবে? তাছাড়া এতটা ঝুঁকি নেবার দরকারই বা কি?

– কাল আমার গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আছে। ফিরে আসতে হবে সকালে। ওদিকে আব্বার শরীর খারাপ। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। কথাটা বলেই দুই ভাই বেরিয়ে পড়লো।

আনুর পায়ে জুতা নেই। খালি পায়ে সে এসেছে। সানুর আছে মাত্র একজোড়া স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। স্যাণ্ডেল জোড়াটি সে হাতে করে নিল। দুইভাই লুঙ্গি ভাঁজ করে কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিল। হাঁটু পর্যন্ত খোলা। এবার রাস্তায় নামলো দুই ভাই।

আকাশে তখন মেঘ আর মেঘ। বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ। ঝির ঝিরে বাতাস। অন্ধকার। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। কাছের মানুষটিকেও দেখা যায়না। এই ঘন-ঘোর দুর্যোগের মধ্যে রাস্তায় নেমেছে দুই ভাই। তাদের

www.pathagar.com

যেতে হবে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ দশ মাইল পথ।

কলারোয়া থেকে রায়টা পর্যন্ত ইট বসানো। যদিও রাস্তার মাঝে মাঝেই ইট খসে গর্ত হয়ে গেছে, তবুও তেমন কোনো অসুবিধা হলো না। কিন্তু সমস্যা হলো রায়টা পার হতেই।

মেঠো পথ। দুই পাশে ধান আর পাটের ক্ষেত। ধানের ধারালো পাতায় কেটে যাচ্ছে তাদের পায়ের চামড়া। জ্বলছে। দুই পাশের কোনো কোনো ক্ষেতে পাট লাগানো। ৫/৭ হাত লম্বা লম্বা পাট গাছ। বাতাসে দুপাশের পাট নুয়ে পড়ে সরু আলগুলোকে ছাদের মত ছেয়ে রেখেছে।

সানু-আনু জীবনে বহুবার এইসব আলপথ ভেঙ্গে কলারোয়া থেকে বাড়ি ফিরেছে। ফলে এক ধরনের অভ্যাস তাদের হয়ে গেছে। এই গভীর অন্ধকার আর পাটের নুয়ে পড়া ছাদের নিচ দিয়ে তারা একরকম অভ্যাস আর অনুমানে ভর করে আলের ওপর দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছে।

তারা হাঁটছে না, খুচ খুচ করে দৌড়াচ্ছে। জেলেরা মাথায় মাছের ডালি নিয়ে, কিংবা কাঁধে বাঁক নিয়ে যেভাবে ফেরিওয়ালারা ঢেউ তুলে তুলে ধীর লয়ে দৌড়ায়, তারাও এখন ঠিক সেইভাবেই দৌড়াচ্ছে। ফলে খুব দ্রুত তারা পথ অতিক্রম করতে পারছে।

পথ চলতে চলতে দুই ভাই গল্প করছে। হাসছে। কবিতা আবৃত্তি করছে। গুন গুন করে গানও গাচ্ছে। এর কারণ হলো ক্লান্তি এবং ভয়কে দূরে ছুড়ে ফেলা। তাদের উদ্দেশ্য কেবল বাড়ি যাওয়া, তা যত কষ্টই হোক না কেন। তারা এতটা পথ এসেছে একরকম নির্ভয়ে।

কিন্তু একটু সমস্যা হলো পাটলি এসে। মেঠো পথ অতিক্রম করে তারা পাটলির রাস্তায় উঠেছে। চলে এসেছে কিছুটা পথ। হঠাৎ তারা সামনের পথ বন্ধ দেখতে পেল। রাস্তার পাশেই বাঁশ ঝাড়। দুটো বাঁশ কাত হয়ে পড়ে রাস্তাটাকে বন্ধ করে রেখেছে।

তারা কিছুটা থমকে দাঁড়ালো। বাঁশ বাগান নিয়ে নানা ধরনের ভূতুড়ের গল্প শোনার কারণেই তাদের এখন আরও বেশি ভয় করছে। বাঁশের নিচ দিয়ে গেলে ভূত-প্রেত যদি বাঁশ চাপা দেয়? কিংবা বাঁশের ওপর দিয়ে গেলে যদি তাদেরকে শূন্যে তুলে নেয়? এ ধরনের ভয় তাদেরকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে তুললো।

www.pathagar.com

সানু আর আনু থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

ক্লান্তি বা কষ্টের বেগটা তখনই বাড়ে, যখন থেমে যাওয়া হয়। তাদেরও হচ্ছে তাই। অর্ধেকের বেশি পথ তারা দৌড়ে পেরিয়ে এসেছে। এখন হঠাৎ থেমে যাবার কারণে পা দুটো কেমন টন টন করছে। নি:শ্বাস পড়ছে ঘন এবং দ্রুত গতিতে। সামনেই বাধা। সানু বললো, এখন কি করা যায়?

আনু কিছুটা শক্ত হয়ে বললো, কি আর করবো! যেতেই তো হবে।

– কীভাবে?

– বাঁশের নিচ দিয়েই চল্।

– যদি...

– আরে ধ্যুৎ! ভূত-প্রেত বলতে কিছু নেই। আর আমাদের সাথে আল্লাহ আছে না! আল্লাহর নাম নিয়ে চল্, কিচ্ছু হবে না।

– আমারও তাই মনে হয়— কিচ্ছু হবে না। তাহলে চল্ সামনে বাড়াই।

– হ্যা তাই চল্ ম্যাভাই।

দুই ভাই যখন একমত, তখন তাদের আর ঠেকায় কে? ব্যাস্! তারা এগিয়ে গেল সেই ভূতুড়ে বাঁশের কাছে। বাঁশের নিচ দিয়ে, মাজাটা বাঁকা করে, মাথার ওপরে হাত দিয়ে বাঁশ একটু উঁচু করে তুলে ধরে তারা জায়গাটা পার হলো। তারপর আবার যথারীতি সেই রকম জেলে-দৌড়।

দৌড়াতে দৌড়াতে তারা পেরিয়ে আসছে একেকটি পাড়া। একেকটি গ্রাম। তারা দৌড়াচ্ছে আর সুর করে আবৃত্তি করছে :

www.pathagar.com

আকাশটারে মুঠোয় ভরে
যাচ্ছি আমি অনেক দূরে
হটাৎ দেখি আলো,
তার পেছনে হাঁটছে কত
পাহাড় নদী সাগর শত
ঝরণা টলো মলো।
বিশ্বটাকে লাগছে এমন
মটরশুঁটি নোলক যেমন
জোছনা মাখা দুল,
আমার সাথে যাচ্ছো তুমি
হাওয়ায় ভেসে পেরিয়ে ভূমি
ভাঙছি শত কূল।

আসলেই তাই। শত প্রতিকূলতা ভেঙ্গে চলছিল তারা।

দুপাশের পাড়া-গাঁয়ের কোনো বাড়িতেই আলো জ্বলছে না। চারদিক কেমন গা ছম ছম করা নীরব নিস্তব্ধ। কাঁচা রাস্তা। অসমতল। তাও আবার কাদা-পানিতে একাকার, পিচ্ছিল।

এই কষ্টকর, দীর্ঘ দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করে তারা যখন বাড়িতে পৌঁছুলো, তখন যে রাতে কতটা গভীর হয়েছে— সেটাও তাদের খেয়াল নেই। উঠোনে পা দেবার আগে গলা ছেড়ে ডাক দিল একসাথে দুইভাই— মা, মাগো।...

তাদের ডাকের আওয়াজ শেষ না হতেই আব্বা বারান্দা থেকে কেশে উঠলেন। অর্থাৎ তিনি জেগে আছেন।

উঠোনে দুই ভাই। আব্বা সিথেনে রাখা হারিকেনের আলোর ফিতাটা বাড়িয়ে দিলেন। মাথা তুলে বললেন, খোকন!

দুই ভাই আব্বার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের শরীর কাদা-পানিতে একাকার। হাঁপাচ্ছে।

আব্বার চোখে-মুখে বিস্ময়। কী ব্যাপার! এত রাতে, এই বাদলা মাথায়, কোথা থেকে এলে?

– লজিং বাড়ি থেকে।

www.pathagar.com

– কী সর্বনাশ! তোমরা এলে কীভাবে?

– এই এলাম আর কি!

ততোক্ষণে মাও জেগে উঠেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনিও হতবাক।

আব্বা তিরস্কার করলেন এতটা ঝুঁকি নেবার কারণে। জীবনে যেন এমনটি আর না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিলেন তাদের।

মা বললেন, এখন আর বকা-ঝকা করে লাভ কি? ওরা কত কষ্ট করে এসেছে।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মা আবার বললেন, তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পাল্টাও। আমি খাবার আনছি।

হাত-পা ধুয়ে বারান্দায় বসে পানি দেয়া ভাত খাচ্ছে দুই ভাই। পরম তৃপ্তির সাথে। মা আর আব্বা বসে আছেন দুই পাশে। খাওয়া শেষ হলে সানু টাকাটা বার করে দিল আব্বার হাতে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, টাকা? টাকা কোথায় পেলে?

– কেন, আমি স্টাইপেন্ডের টাকা পেয়েছি না! এখানে পুরোটাই আছে।

– আমাকে দিচ্ছ কেন?

– আপনার ওষুধ কিনতে লাগবে। রেখে দিন।

বোঝাই যাচ্ছিল, আব্বার হাত কাঁপছিল। টাকাধরা হাতটা আর মুঠো হচ্ছিল না। তার চোখদুটো ভিজে গেল। তিনি হাতটি বাড়িয়ে দিলেন মায়ের দিকে। কাঁপাস্বরে বললেন, নাও, টাকাগুলো তুলে রাখ।

খাওয়া শেষ করে দুই ভাই আব্বার দুইপাশে শুয়ে পড়েছে। মা ঘরে। শোবার মত তাদের আর কোনো জায়গা নেই। দুইভাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাদের চোখের পাতায় তখন অন্যধরনের এক আনন্দ।

বিজয়ের এক প্রজাপতি তখন তাদের চোখের পাতায় কেবলই দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। তারা পরম আনন্দে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু আব্বা? আব্বার চোখে ঘুম নেই।

মায়ের চোখেও কি ঘুম আছে? তিনি ছাড়া জানেনা কেউ।

www.pathagar.com

এই রাত শেষ হবে

এই রাত শেষ হবে থেমে যাবে ঝড়
মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে বেদনার খড়।

অনেক চেষ্টার পরও আব্বা তার পেনশনের টাকাটা পেলেন না।

তারা ঘুষ চায়। আব্বা কিছুতেই ঘুষ দেবেন না। অফিসের এক কেরানী আব্বাকে আশ্বাস দিয়েছিল, সামান্য কিছু টাকা দিলে সে যাবতীয় কাজ করে দেবে। আব্বা তাতেও রাজি হননি।

www.pathagar.com

টাকার অভাবে দুবেলা দুমুঠো খাবারও জুটছে না। মায়ের শাড়ি কেনা দরকার। আনুর একটি মাত্র জামা। তাও শতছিন্ন। খালি পায়ে স্কুলে যায়। সংসারে এত অভাব, এত কষ্ট, তবু— তবুও আব্বা ঘুষ দিয়ে তার প্রাপ্য টাকা নিতে রাজি নন।

মাও আব্বার মত। তিনিও চাননা ঘুষ দিয়ে টাকা আদায় করতে। বলেন, দরকার হলে আরও কষ্ট করবো, না খেয়ে মরে যাব, তবুও আপনি ঘুষ দিতে যাবেন না।

আব্বার প্রতি মায়ের এটা একান্ত অনুরোধ।

আব্বা খুব খুশি হন মায়ের কথায়। বলেন, ঠিকই বলেছে। ঘুষ খাওয়া যেমন অপরাধ, ঘুষ দেওয়াও তেমনি অপরাধ। আমরা জেনে বুঝে এই পাপ কাজ করতে পারিনে।

মাও যোগ দেন আব্বার কথায়। বলেন, সত্যিই তো। আমরা অপরাধ করলে হয়তো বা আমাদের দুটো সন্তানও সেই অপরাধের পথে ধাবিত হবে। আর যাই হোক আমরা তাদেরকে বেপথু করতে পারিনে। তারা নষ্ট হয়ে গেলে তাদের পাপের ভাগীদার আমাদেরও হতে হবে।

মায়ের কথা শুনে আব্বার বুকটা ভরে উঠলো আনন্দে। তিনি বুঝলেন, সুখ-শান্তির মাপ-কাঠি কেবল অর্থ নয়, সম্পদ নয়, প্রাচুর্য নয়। প্রকৃত সুখের সংজ্ঞা অন্য কিছু। এই যেমন এখন তাকে নিজেকে খুবই সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

পাপ থেকে মুক্ত থাকার আনন্দই আলাদা। হৃদয়ের প্রশস্ততা, আত্মার স্বচ্ছতা— এসবই সুখের উপাদান। যাদের ভেতর সততা নেই, পবিত্রতা নেই— তারা কখনো সুখী হতে পারে না। থাক না তাদের কোটি টাকা। থাক না তাদের পাহাড়সমান সম্পদ।

রাত বেশ গভীর।

পাড়ার কেউ জেগে নেই। কেবল জেগে আছে এই বাড়ির তিনটি প্রাণী। আনু হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আব্বা তার পড়া শুনছেন। পানের ডালা সামনে নিয়ে মা বসে আছেন।

আব্বা বললেন, আমাকে একটা পান দাও না!

ডালা নাড়া-চাড়া করে মা বললেন, পান তো নেই।

www.pathagar.com

– মোটেও নেই?

– না!

– ঠিক আছে, একটু চুন-সুপারি দাও।

আনুর কানদুটো আবার খাড়া হয়ে উঠলো। মা বললেন, সুপারিও নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আব্বা আনুর পড়ার দিকে মনোযোগ দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষার আর কত বাকী?

– এইতো এক মাস।

– কেমন মনে হয়, পারবে তো?

– ইনশাআল্লাহ।

মা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেলেন। খুব ধরা গলায় বললেন, ছেলের এখন লেখা-পড়ার খুব চাপ। এসময় তার ভাল খাবারের দরকার। এমনি কপাল পোড়া, যে তাও দিতে পারিনে!

মায়ের চোখে কি পানি? তিনি সম্ভবত কাঁদছেন।

আনু হেসে বললো, কী যে বলো না মা! ভাল খেলেই যে পরীক্ষায় ভাল করবো তার কি কোন মানে আছে? পাড়ার কত ছেলেই তো ভাল খায়, ভাল পরে, কই ম্যাভায়ের মত কেউ কি রেজাল্ট করতে পারে? লেখা-পড়ায় ভাল করার জন্যে খাওয়া নয়, দরকার শুধু তোমাদের দোয়া, বুঝলে?

আব্বা হাসলেন।

মাও তাকিয়ে আছেন আনুর দিকে।

মায়ের দোয়ার যে কোনো শেষ নেই তা বলাই বাহুল্য। সানুর প্রতিটি পরীক্ষা শুরুর দিন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই রোজা থাকেন মা। আনুর পরীক্ষার সময়ও তিনি তাই করেন। যেন সম্পদ নয়, দোয়া আর কামনা দিয়েই ছেলেদুটোকে ভরে তুলতে চান মা আর আব্বা।

হারিকেনের আলোটা ক্রমশ কমে আসছে। আলো যত কমে আসে, ফিতাটা ততোই বাড়িয়ে দেন আব্বা। মাঝে মাঝে ঝাঁকি দিয়ে কেরোসিন ছড়িয়ে দেন ফিতায়। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ!

তেলশূন্য এই নিবু নিবু হারিকেনটার মতই তাদের সংসার, তাদের জীবন। তবুও আফসোস নেই এতটুকু। আনু ভাবে, হারিকেনটা এখন নিবে যাবে।

www.pathagar.com

কাল এতে আবার তেল ভরানো হবে। এটা আবার জ্বলবে। এই জ্বলা আর নিভা— এইতো জীবন। ভাঙ্গা আর গড়া, উত্থান আর পতন, দু:খ আর সুখ— এসবই তো জীবন-মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এ নিয়ে দু:খ করে কোনো লাভ নেই।

বোতলে আর এক ফোঁটা কেরোসিন নেই।

হারিকেনের ফিতে যতক্ষণ ভিজে ছিল, ততোক্ষণ কিছুটা জ্বলেছে। ফিতেটা এখন শুকিয়ে গেছে। সুতরাং সে আর জ্বলতে পারবে না।

জ্বললোও না। ওটা আপনা থেকেই দপ্ করে নিভে গেল।

দৃশ্যটা মানুষের জীবন-মৃত্যুর সাথে তুলনীয়। ভাবলো আনু।

আনুর এই এক অদ্ভুত কল্পনা শক্তি। সে মুহূর্তেই প্রতিতুলনা করতে পারে। পারে কল্পনায় বহুদূর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করতে। সাধারণ দেখার চাইতে তার দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর। সে দৃশ্যমানের বাইরেও দেখতে পারে। এই যেমন এখন সে দেখছে, একটি মানুষ বেঁচেছিল ধুকে ধুকে, হারিকেনের নিবু নিবু আলোর মত। কিন্তু হঠাৎ করেই সে মারা গেল। যেমন দপ্ করে নিভে গেল বাতিটা।

অন্ধকারেই আনু বইখাতা দেয়ালের দিকে সরিয়ে রাখলো।

তার মাথার ভেতর গিজ গিজ করছে রাজ্যির ভাবনা।

অভাব নয়, দু:খ নয়, কষ্ট নয়— সে এক অপার্থিব ভাবনা। অবর্ণনীয় ভাবনা। সেই ভাবনার মধ্যে আছে সানু, আছে কপোতাক্ষ, আছে কোচুর বিল, আছে শীতের ভোরে পায়ে শর্ষে ফুল জড়ানো অবস্থায় খেজুর গাছে ওঠা এবং দুই দিকের দিগন্তজোড়া মাঠের দৃশ্য দেখা।

হঠাৎ আব্বার কথায় সে ফিরে এলো ভাঙ্গা ঘরের মাটির বারান্দায়। বারান্দায় শুয়ে শুয়ে মাটির গন্ধ নিচ্ছে আনু।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বহু বছর আগে চালের ওপর গোলপাতার ছাউনি দেয়া হয়েছিল। এত বছর পার হয়ে গেল। চালে আর কুটো কিংবা গোলপাতা ওঠেনি। পাতাগুলো রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হতে হতে বাতা ও রো-র মাঝে মাঝেই ব-দ্বীপের মত হয়ে গেছে। ফুটো দিয়ে বর্ষাকালে পানি পড়ে। সেই পানির ফোঁটায় বারান্দায় গর্ত হয়ে যায়। শীতের সময় চালের ফুটো দিয়ে শিশির ঝরে।

www.pathagar.com

বারান্দায় বসে কিংবা চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গোনা যায়। সে আর সানু কতদিন যে এভাবে শুয়ে শুয়ে চালের ফুটো দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সুর করে গেয়েছে :

একটা তারা
দুটো তারা
ঐ তারাটার বউ মরা
পুঁটি মাছের গজগজানি
পাবদা মাছের বিয়ে,
বর আসবে পালকি নিয়ে
টোপর মাথায় দিয়ে।

ঘরে যখন বাঁশের কঞ্চির বেড়া ছিল, তখন দুই ভাই ঘরের বেড়া ফাঁক করে পুবের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতো। বেড়ার ফাঁক দিয়ে মাঠ, শেষে বড় রাস্তা, তারপর নগর, মাঠশিয়ার গ্রাম স্পষ্ট দেখা যেত। দুই ভাই খুব মজা করে জীর্ণ ঘরের কঞ্চির বেড়া ফাঁক করে কখনও বা ভোরের সূর্য দেখতো।

এখন বেড়ার বদলে মাটির দেয়াল উঠেছে। কিন্তু দেয়ালটির বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। বর্ষার পানি পড়ে পড়ে দেয়ালের মাথা গলে পড়েছে। এবড়ো-থেবড়ো, ভাঙ্গাচুরা দেয়ালে দেখা দিয়েছে অনেকগুলো ফাটল। ফাটলের মধ্যে চড়ুই পাখি বাসা বেঁধে দিব্যি দিন যাপন করছে। মায়ের আশংকা, ঐসব ফাটলের মধ্যে সাপ-টাপও থাকতে পারে। একটি মাত্র ঘর। তাও অর্থ অভাবে সংস্কার করতে পারেননি আব্বা।

এসব নিয়ে আনুর কোনো কষ্ট নেই। তার স্বপ্ন কেবল আগামী দিনের জন্যে। যেমন রাতের পর সূর্যের প্রতীক্ষায় থাকে মানুষ, ঠিক তেমনি সে প্রতীক্ষায় আছে।

মা বারান্দা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এখন ঘরে শুতে যাবেন। আব্বা আনুকে বললেন, এসো বাবা, আমরাও শুয়ে পড়ি। কাল সকালে পড়ো।

আব্বার পাশে শুয়ে পড়লো আনু।

শুয়েই তার চোখদুটো চলে গেল চালের ফুটো দিয়ে আকাশের তারার

www.pathagar.com

দিকে। কী অসম্ভব জ্বলজ্বলে একেকটি তারা।

ঝলমলে আকাশ। চালের ফুটো দিয়ে সবই কেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আকাশ আর আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল আনু। আব্বা দক্ষিণ দিকে মুখ ঘুরিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তার চোখদুটো উঠোনের দিকে। আনু ডাকলো, আব্বু!

– বলো বাবা!

– দেখেছেন আকাশের তারাগুলো কত সুন্দর।

– সত্যিই সুন্দর। ঠিক যেন শিশুদের মুখ।

– আহ্ বাইরের দিক থেকে নয়, এদিক দিয়ে দেখুন।

– কোন্ দিক থেকে?

– এইতো, চালের ফুটো দিয়ে।

– চালের ফুটো দিয়ে!

আব্বা যে এটা জানেন না, তা নয়। তবে ছেলের কথায় তার বুকটাও ফুটো হয়ে গেল। চালের ফুটো দিয়ে আকাশের তারা দেখে ছেলে— এই যন্ত্রণা আর কষ্ট যে কত বড় তা তো আর ভাষায় ব্যক্ত করবার মত নয়!

আব্বা নীরব হয়ে গেলেন। তার চোখদুটো ভিজে গেল।

আনু আবার ডাকলো, আব্বু!

– বলো বাবা।

– না, থাক কিছু না। বলে সে পাশ ফিরলো।

আব্বা বুঝে নিলেন আনুর না বলা কথাগুলো। তিনি আনুকে জড়িয়ে ধরলেন পরম আদরে, বুকের কাছে। তার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে খুব ক্লান্তস্বরে আব্বা আবৃত্তি করলেন :

এই রাত শেষ হবে থেমে যাবে ঝড়
মেঘ ফুঁড়ে উড়ে যাবে বেদনার খড়।
সাহসী জোয়ার এলে ভরে যাবে কূল
নবীন তারার চোখে সাতরঙা ফুল।

.....

পাথরের পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ।

www.pathagar.com

আবৃত্তি শেষ করে আব্বা বললেন, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে?

– না আব্বু। কিছু বলবেন?

– কবিতাটি তোমার কেমন লাগলো?

– খুব ভাল। তাছাড়া আপনার আবৃত্তির ঢংটাই তো আলাদা। দারুণ লাগে। মাইকেলের শক্ত-শক্ত কবিতাগুলোও যেভাবে আবৃত্তি করেন, কেবল শুনতেই ইচ্ছা করে। আর একটি কবিতা শোনান না আব্বু!

– রাত অনেক হয়েছে। ঘুমাবে কখন?

– ঘুম যে আসছে না।

– না ঘুমালে যে শরীর খারাপ করবে।

– করবে না। কত রাত তো না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ম্যাভাই তো এখনো সারারাত জেগে লেখা-পড়া করে।

– ও কিন্তু খুব জেদি।

– হ্যা।

– জেদি বলেই কিন্তু ও পারে। যে সিদ্ধান্ত একবার নেয়, সেটা সে করেই ছাড়ে।

– আর আমি?

– তুমি তো তার চেয়েও। কেউ কম নয়। এজন্যেই তো ভরসা পাই কিছুটা।

– সত্যি বলছেন? সত্যিই কি আমাদের করে ভরসা পান?

– শোনো পাগলের কথা! কেন পাবোনা? তোমরা কি পাড়ার আর দশটা ছেলের মত? তোমরা নষ্ট হবে কেন? তোমাদের নষ্ট হবার পেছনে তো কোনো কারণ দেখছি না।

www.pathagar.com

আব্বার কথায় আনুও আশ্বস্ত হলো। তার মনটা বেশ হাল্কা হয়ে উঠেছে। বললো, আব্বু আর একটা কবিতা শুনতে চাই। শোনাবেন?

– শোনাতে তো পারি। কিন্তু তোমার মা যদি জেগে যান, আর যদি শোনেন আমরা বাপ-বেটা রাত জেগে কবিতায় মজে আছি, তাহলে কিন্তু বকা-ঝকা করবেন।

– আপনি শোনান। মাকে আমি ম্যানেজ করবো।

আব্বা আবৃত্তি শুরু করলেন :

ভূ-গোলকে ভূতের ছায়া দু'পাশে তার ক্ষত
বিশ্বটাকে শিলায় ফেলে পিষছে অবিরত।
পৃথিবীটা তপ্ত কড়াই কামারশালার ভাপ,
ভূ-গোলকের পেটের ভেতর কাল কেউটে সাপ।
দানবগুলো পিষছে মানুষ হাতির মতো পায়ে
ভাঙছে হাজার নগর-বাড়ি বুলেট বোমার ঘায়ে।
ভয়ে থর থর বিশ্ব এখন নিঝুম কবরপুরি
ঘুমের ঘরে ডাকাত হাঁটে, চোখের ভেতর ছুরি।
ফাঁসির দড়ি গলায় বেঁধে টানছে বর্গী কষে।
অলসভাবে ঘুমায় কারা? আর থেকোনা বসে।
বিশ্বমানব বন্দী হয়ে কাঁদবে কত আরো?
শতাব্দীর সিংহ যারা— ভাঙতে তারা পারো।
গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এসো, থামাও আহাজারি।
আমি তো ভাই ক্ষুদ্র অতি, একা কি আর পারি?
ভূগোলটারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ো
গড়ার জন্য ভেঙ্গে ফেলা কাজটা অনেক বড়।

আবৃত্তি শেষ হলে আব্বা জোরে একটা দম ছাড়লেন।

আনু যেন কবিতার প্রতিটি লাইনের সাথে মিশে গেছে। আব্বার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, আসলেই ঠিক।...

– তার মানে?

www.pathagar.com

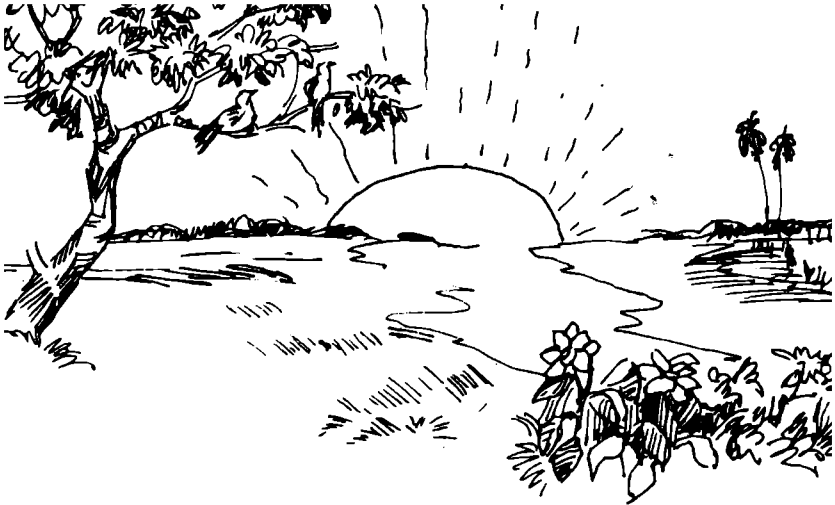

– ওই যে, 'গড়ার জন্য ভেঙ্গে ফেলা কাজটা অনেক বড়'।...

– কবিতাটির অর্থ তাহলে বুঝতে পেরেছ?

– মুটামুটি।

– কিন্তু নতুন পৃথিবী গড়ার জন্যে যে তেমনি সাহসী মানুষের দরকার। সে রকম মানুষ কোথায়?

– কেন আব্বু! আমরা কি তেমন সাহসী হতে পারিনে? আমরা চেষ্টা করলে কি নতুন পৃথিবী গড়তে পারবো না?

– কেন পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। কেউনা কেউ তো পেরে যাবেই। ওই যে, 'ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ'!

– আমিও তাই মনে করি আব্বু।

– কিন্তু এর জন্যে চাই অপরিসীম ধৈর্য, সাহস, সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, আর সুদৃঢ় মনোবল।

– আমাদের দুই ভায়ের তা আছে। বলুন, আছে না?

– তাতো আছেই। কিন্তু শুধু দুইজনই তো আর যথেষ্ট নয়।

– শুধু দুইজন হবে কেন? এরকম কত শত বারুদ আছে তার কি কোনো ইয়ত্তা আছে? আপনি শুধু দোয়া করুন, অমরা যেন পেরে যাই।

– অবশ্যই দোয়া করছি। তোমরা না পারলে নতুন সূর্য উঠবে কীভাবে?

www.pathagar.com

তোমরা জাগলেই তো প্রভাত হবে।

আনুর খুব ভাল লাগলো আব্বার কথায়।

একটু চুপ থেকে আব্বা আনুর মাথাটা নিজের বুকের ওপর তুলে নিলেন। আব্বার পাঁজরের হাড্ডিগুলো টিয়া পাখির খাঁচার শিকের মত কেমন উঁচু এবং স্পষ্ট হয়ে আছে। জীবনের কত ক্ষুধা, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা যে এই বুকে জমা আছে তার কোনো হিসাব নেই। আনুর মুখের ডানপাশটা আব্বার পাঁজরের হাড়গুলোর অস্থিত্ব টের পাচ্ছে।

আব্বা ডাকলেন, বাবা!

আনু খুব নিচুস্বরে জবাব দিল, জ্বি।

– বড় হয়ে তোমার কি হতে ইচ্ছে করে বলোতো।

আনু যেন বহু আগে থেকেই জবাবটা ঠিক করে রেখেছিল। বললো, একজন ওঝার মত হতে ইচ্ছে করে আব্বু।

– ওঝা! তার মানে?

– হ্যা, আব্বু। ওঝা যেমন সাপে-কাটা রোগীর ঝাড়-ফুঁক কিংবা নিজের মুখে বিষ চুষে নিয়ে রোগীকে ভাল করে তোলে, আমিও তেমনি, ওঝার মতই পৃথিবীর তাবৎ দু:খ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অভাব-অভিযোগ সব— সবই নিজের ভেতর চুষে নিয়ে পৃথিবীকে সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর মত পূত-পবিত্র করতে চাই। ফোটাতে চাই পৃথিবী নামক এই সাপে— কাটা রোগীর মুখে এক চিলতে হাসির রেখা। বলুন, আব্বু— আমি কি তা পারবো?

আব্বা কাছে, আরো কাছে টেনে নিলেন আনুর মাথাটি। একেবারে বুকের সাথে চেপে ধরে বললেন, কে বলেছে পারবে না? অবশ্যই পারবে বাবা। তুমি পারবে, তোমরা পারবে। তোমাদের চোখে-মুখে আমি সেই পেরে ওঠার সূর্যটা জ্বলে উঠতে দেখছি। বিশ্বাস করি, সাগর ভাঙতে ভাঙতে একসময় তোমরা ঠিকই পৌঁছে যাবে আলোকিত উপকূলে।

আব্বার কথা শেষ না হতেই নোচুর কুড় থেকে কোয়াক্ কোয়াক্ করে তারস্বরে ডেকে উঠলো রাতজাগা বালিহাঁসের ঝাঁক। ■

www.pathagar.com

আনোয়ার এবং তার বড় ভাই সানোয়ার। তাদের পরিবারে আছেন মা আর অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক আব্বা। খুবই দরিদ্র একটি পরিবার। দুই ভাই লেখাপড়া করে। তাদের আছে অনেক অভাব, অনেক দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু তারপরও আছে তাদের চোখে আকাশ সমান স্বপ্ন। আছে সমুদ্রের মত সাহস আর ঝড়ের মত তেজ। এই দুইভায়ের মাধ্যমে আমরা জানবো ভাঙতে ভাঙতে কিভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে হয়। কিভাবে জ্বালাতে হয় শত বেদনার মধ্যেও আশার প্রদীপ।

আনোয়ারদের গ্রামটি আমাদের খুব চেনা – কাছের, আর দশটি গ্রামের মত। থানা শহর থেকে দশ মাইল ভেতরে। কপোতাক্ষর পাড়ে, লতাগুল্ম, গাছপালা, ফসলের মাঠ, দীঘি, পুকুর আর বিল নিয়ে গ্রামটি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়াঘেরা, পাখিডাকা, শান্ত-স্থির একটি গ্রাম - বাঁকড়া।

গ্রামের মানুষগুলোর প্রায় অর্ধেকেই অশিক্ষিত। অশিক্ষিত কিন্তু হৃদয়বান। সচ্চরিত্র আর পবিত্রতা তাদের ঘিরে আছে। কৃষি তাদের প্রধান কাজ। খেটে খাওয়া, রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে সারাদিন মাঠে কাজ করা একেকজন পোড়খাওয়া সাহসী মানুষ। তাদের অভাব আছে, কিন্তু হৃদয়ের প্রাচুর্য আছে তার চেয়েও অনেক বেশি।

এই সুদূর গ্রামের ছেলে আনোয়ার। সে বেড়ে উঠছে শত প্রতিকূলতার মধ্যে। সে বেড়ে উঠছে হাজারো প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে। সে বেড়ে উঠছে পাথর কেটে কেটে । এবং আনোয়ার - এক আনোয়ার ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ-কোটি আনোয়ারের ভেতর।

সময়টা ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১। সেই সময়ের এটা এক কঠিন জীবনের জলছবির খণ্ডাংশ মাত্র। তবুও এর মধ্য দিয়েই আনোয়ার স্বপ্ন দেখে একটি নতুন পৃথিবী গড়ার। সে জানে নতুন পৃথিবী গড়তে হলে প্রথমে নিজেকে হতে হবে আলোকিত এবং দুঃসাহসী এক মানুষ। দু'হাতে ক্রমাগত ভেঙে যেতে হবে বাধার পর্বত। টপকাতে হবে আগুনের টিলা।

আর এভাবে উন্মাতাল ঢেউয়ের গম্বুজ ভেঙেই পৌছুতে হবে সূর্যজাগা শান্ত উপকূলে। সুতরাং, এইতো সময় এখন সাগর ভাঙার।

দ্রাবিড় প্রকাশন, ঢাকা।